দ্বিতীয় অধ্যায়

সমকালের প্রেক্ষিতে বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা

১৯৩৯, ১ সেপ্টেম্বর মানব ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। পৃথিবীকে গ্রাস করে এই যুদ্ধ ঃ

'১৯৩৯ এর ১ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৫ এর ২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ। আর সামরিক ক্রিয়াকলাপ চলে তিন মহাদেশ এবং সাগর মহাসাগরের বিশাল বিশাল এলাকা জুড়ে। যুদ্ধে নিহতের সংখ্যা ছিল ৫ কোটিরও বেশি। বৈষয়িক ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৪ লক্ষ কোটি ডলার। ধ্বংসস্তুপে পরিণত হয় অসংখ্য শহর আর গ্রাম; বিলুপ্ত হয়ে গেল মানব প্রতিভার অজস্র মহান সৃষ্টি।'[১]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দশক চল্লিশের দশক। যদিও এই সময়টা ধরা হচ্ছে ১৯৩৭ - ১৯৫০ পর্যন্ত। শুধু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা বললে হবে না এই শতকের প্রথম দিকে ঘটেছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই দুই বিশ্বযুদ্ধের মর্মান্তিক চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে সাহিত্যে ও সমাজজীবনে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বেশ কয়েক বছর পর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করে। আমাদের দেশের যুব সমাজ ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে ওই মীরাট ষড়যন্ত্র[২] মামলার পর ওই যুবসমাজের কিছু অংশ কৌতূহলী হয়ে ওঠে কম্যুনিজম সম্বন্ধে।

অবশ্য বাঙালী বুদ্ধিজীবীরা এই কম্যুনিজম সম্বন্ধে কিছুটা জেনেছিলেন ১৮৭৫ - ৭৬ -এর মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সাম্য' (১৮৭৯) প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কম্যুনিজম এর উল্লেখ করেছেন :

> "ভূমি এবং মূলধন, যাহার দ্বারা অন্যধনের
> উৎপত্তি হইবে, তাহা সামাজিক সর্বলোকের
> সাধারণ সম্পত্তি হউক। যাহা উৎপন্ন হইবে,
> তাহা সর্বলোকে সমভাবে বন্টন করিয়া লউক। ইহাই
> প্রকৃত কম্যুনিজম।"[৩]

আবার কাজী নজরুল ইসলামের 'সাম্যবাদী' কবিতা প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকায়।

১৯২৬ এর আগষ্ট মাসে 'লাঙল' পত্রিকার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় 'গণবাণী' পত্রিকা মুজফ্ফর আহমেদ এর সম্পাদনা করেন।

বাঙালী তরুণ সমাজ কম্যুনিজম সম্পর্কে কিছুটা আকৃষ্ট হয়েছিলেন ১৮৮০ - ৮২ এর মধ্যে। ঊনিশ শতকেই কম্যুনিজম একটি পরিচিত ধারণা হয়ে উঠেছে বেশ কিছু পরিমাণ বাঙালীর কাছে। তবে এই কম্যুনিজমের প্রতি শ্রদ্ধা না থাকলেও বাঙালী সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কম্যুনিজম সম্পর্কে ভেবেছেন এবং বুঝতে চেষ্টা করেছেন। যদিও এ কম্যুনিজম ঠিক মার্কসিজম্ নয়। এখানে শ্রমিক কৃষকদের অর্থনৈতিক ও সমাজিক পরিস্থিতি নিয়ে চিন্তাভাবনার কথা থাকলেও এ নিয়ে সেরকম বিশ্লেষণী মনোভঙ্গী নেই। সমাজকে দারিদ্র্য মুক্ত করার মনোভাব তখন সেভাবে প্রাধান্য পায় নি। কেননা 'দাস ক্যাপিটাল' বইটি বিভিন্ন দেশে সেরকম স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি ১৮৭৫ এর আগে। বইটির সম্পর্কে এদেশে আগ্রহের সঞ্চার ঘটে ১৯১৭ তে রুশ বিপ্লবের পর, যখন এই বিপ্লব সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে পেরেছিল মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের দিকে। অবশ্য এক্ষেত্রে মানবেন্দ্রনাথ রায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের অবদান স্বীকার্য। জাতীয়তাবাদী ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৯২০ তে মস্কো গিয়ে লেনিনের সঙ্গে দেখা করেন। ১৯২৪ এ ভারতে ফিরে মার্কসবাদ সম্পর্কে লেখেন- "ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি" নামে একটি গ্রন্থ, যা 'পরিচয়' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় এবং কিছুটা আলোড়ন তোলে। জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছদ্মনাম নেন মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে ১৯১৪ সালে। আত্মগোপন করেন দেশের বাইরে গিয়ে ক্যালিফোর্নিয়াতে। ১৯১৭ তে মেক্সিকো যান। সেখানে সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। 'তাশকন্দ'- এ ভারতের কমিউনিস্ট নামে একটি দল গঠন করেন ১৯২০ সাল, ১৭ অক্টোবর-এ যা সেই সময় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।

১৯২৩ এ আবির্ভূত 'কল্লোল' পত্রিকা। এই সময় শৈলজানন্দ, মনীশ ঘটক, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার প্রমুখরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধিতা করে দারিদ্র, যৌনতা, অসৌন্দর্য, কামনা, বাসনাকে আধুনিক ভাবে প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়েছেন। কবি বিষ্ণু দে-এর পরে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আবেগকে দূরে রেখে রচনার কাজ করেন।

১৯৩১ এ প্রকাশিত হয় 'পরিচয়' পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রাকাশের সঙ্গে সঙ্গেই বুদ্ধিজীবীরা ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দেন। সকলেই কিন্তু মার্কসবাদী ছিলেন না, কিছু বুদ্ধিজীবী মার্কসবাদীদের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। 'পরিচয়' পত্রিকায় খোলাখুলিভাবে

আলোচিত হয় রুশ বিপ্লবের কথা, ঐতিহাসিক বস্তুবাদের আলোচনার মতো নানান আলোচনা এবং এ আলোচনা করেন ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুশোভন সরকার, হিরণ কুমার স্যান্যাল, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ মার্কসবাদী লেখক ।

১৯৩২-৩৩ এর মধ্যে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রগতি চেতনা বিষয়ে কিছু কিছু প্রবন্ধ লেখেন অন্যান্য পত্রিকাতে এবং সেগুলি ১৯৪৫ এ 'সাহিত্যে প্রগতি' নামে একটি সংকলনের অন্তর্ভূক্ত হয়। সাহিত্যিক বিচারে বোধ হয় মার্সকবাদী ভাবনা পদ্ধতির শুরু এখানেই। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি' প্রকাশিত হয় এই সময় যা সবচেয়ে বড় ঘটনা। এরপর ১৯৩৯ খ্রী. প্রকাশিত ও ১৯৪১ খ্রী. প্রকাশিত 'অগ্রণী' 'অরণি' প্রভৃতি পত্রিকা যুক্ত হয়। 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' বা 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী' সঙ্ঘের সঙ্গে। ১৯৪০ এ বন্ধ হয়ে যায় 'অগ্রণী' ও ১৯৪৮ পর্যন্ত চলে 'অরণি' পত্রিকা। রাাজনীতি ও সাহিত্য উভয় ক্ষেত্রেই উদার মতামত দিয়েছিল 'অরণি' পত্রিকা। কমিউনিস্ট পার্টির ওপর ব্রিটিশ সরকার নিষেধাজ্ঞা তোলে ১৯৪১ -এ। ১৯৪২ খ্রী. সারা ভারতবর্ষ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনে সাহায্যকারী ভূমিকা পালন করে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি এবং আর.এস.পি। কমিউনিস্ট পার্টি-এর বিরোধিতা করে। কমিউনিস্টদের সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলি অত্যন্ত সক্রিয় এবং সুপরিচালিত ছিল ১৯৪২ থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত।১৯৪৩ - ১৯৪৬ এই সময়ে তাঁরা প্রকাশ করেন বেশ কিছু পুস্তিকা ও কবিতা সংকলন। ১৯৪৪ এ প্রতিষ্ঠিত 'গণনাট্য সংঘ' মার্কসীয় চেতনা ছড়িয়ে দেয় চারিদিকে। ১৯৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। সঙ্গে ১৯৪৬ সালে হয় নৌ বিদ্রোহ, ডাক ধর্মঘট এবং অন্যান্য একাধিক ধর্মঘট। এই সময়েই বঞ্চিত শ্রমিক কৃষকদের দাবি জোরালো হয়ে তেভাগা আন্দোলনে পরিণত হয়। যা কিছু ফসল সেই সময়ে ভাগচাষীরা উৎপন্ন করত তার ১/৩ ভাগ খাজনার পরিমাণ কমিয়ে দেওয়ার জন্য তারা তীব্র প্রতিবাদ করে। ভাগচাষীদের আন্দোলন শেষপর্যন্ত আকার নেয় গেরিলা যুদ্ধের। কমিউনিস্ট পার্টি ভারতবর্ষের নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত মানুষদের প্রতি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এইসব মানুষদের নিয়ে ভাবনা চিন্তা করেন বাংলা সাহিত্যের সকল কালের কবি সাহিত্যেকেরাও। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও কবি নজরুল ইসলামের।[৪] দেশজ ভাবনার সঙ্গে মার্কসবাদী ভাবনার যোগ ঘটিয়ে দেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন তাঁর অসাধারণ সৃজনশীল সত্ত্বা। এই ভাবনা আরো প্রসারিত হয় চল্লিশের দশকে নানা ধরণের গল্প- উপন্যাস- নাটক- গান- ছবি এবং

কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে। তাঁদের রচনায় ফুটে উঠতে লাগল ঔপনিবেশিক বিপ্লবে পীড়িত, জর্জরিত মানুষগুলোর আর্ত যন্ত্রনার মূল কারণ অন্বেষণ। তাঁরা সেই সময় অনুসরণ করলেন কার্লমার্কসকে । জানতে পারলেন মানুষের দীর্ঘদিন লাগাতার আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটে। আর ওই পরিবর্তন স্বীকার করে নেন[৫] শিল্পী ও লেখক।

কোন কিছুই অপরিবর্তনীয় নয়, সবই পরিবর্তনশীল। সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত লেখক সংঘের লেখক ও শিল্পীগণ 'সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদ'-এর কথা বলেন। তাঁদের মতে জীবন গতিশীল, তাই সাহিত্যও পরিবর্তনশীল :

"ইতিহাসের মতো জীবন ও শিল্প নিত্য
বিবর্তনশীল। বাস্তবকে এভাবে বিশ্লেষণ করে এঁরা
মনে করেন শিল্প যেমন হবে পুরোনো পৃথিবীর
ক্ষতিকর প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তেমনি সমাজতান্ত্রিক
ব্যবস্থা ও শিল্পী সম্ভাবনার উন্নতি সাধক"।[৬]

লেখকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ম্যাক্সিম গোর্কি। তিনি মার্কসবাদকে আশ্রয় করেন এবং আশাবাদের কথা বলেন। তবে এ আশাবাদের মধ্যে কোন রোমান্টিকতা ছিল না, ছিল ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদী যাঁরা ছিলেন তাঁরা এক অদ্ভুত মুক্তির কথা বলেন পড়ুয়াদের। যে মুক্তি মানুষজনকে অপঘাত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে অবশ্য তা লোক জনের অব্যর্থ বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সম্ভব হয়। বাস্তববাদী যাঁরা তাঁরা বিষয়ের কথা বলেন। কলাকৈবল্যবাদীরা রূপের কথা বলেন আর সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদীরা এসব কোনো কথাই বলেন না, তাঁরা মানুষকে সংগ্রাম মুখর করে তোলেন, আগামী দিনে যা সম্ভাব্য তা নিয়ে নিশ্চিত করে তোলেন। একই ভাবনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কথা সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মতে, যাঁরা লেখক, যাঁরা শিল্পী তাঁরাও জাতির কাছে গুরুদেবের মতো বাবার মতো সম্মান পেয়ে থাকেন কেননা জীবনে বেঁচে থাকার নিয়ম অনিয়ম তাঁরাই শেখান :

" ..... দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-
শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের

মানুষকে কান মলে শাসন করার অধিকার
খাটাতে লেখক- শিল্পীর দ্বিধা বা ভয়
হবার কথা নয়।[৭]

চল্লিশের দশকের কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও ম্যাক্সিম গোর্কি এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষকে জীবনাদর্শ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কাজী নজরুল ইসলামও বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষদের নতুন ভাবে জেগে ওঠার কথা বলেছেন, তার জন্য জয়ধ্বনি দিয়েছেন ভগবানের পক্ষে। কবি বিষ্ণু দেও মানুষের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতাকে নিজের সময়ের বিস্তারের মধ্যে স্থাপন করার ইচ্ছার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন।

শিল্প সাহিত্য ক্ষেত্রে বিষ্ণু দে অতিবামনীতিকে সমর্থন করতেন না[৮], বিপরীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক্ষেত্রে আবার বামনীতিকে সমর্থন করতেন। কবি মার্কসীয় সাম্যবাদের স্বপ্ন দেখেন, তিনি জনগণের মিলিত শক্তির সামনে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয় তখন নাৎসী বাহিনী ও ফ্যাসিস্ট বাহিনী সোভিয়েত আক্রমণ করে। ফলে সাম্যবাদীদের কাছে এই বিশ্বযুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে সেই সময়কার ঘটনা ও আন্দোলনকে দেখেন। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, নিষ্ঠা, সততা, সমকালীন ঘটনা ও আলোড়নকে তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন। ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করে ১৯৪৭ -এ। তবে স্বাধীনতা আন্দোলন বা স্বদেশী আন্দোলনের অস্থিরতা নিয়ে কোনো কবিতা তিনি রচনা করেন নি। স্বাধীনতা পরবর্তী মধ্যবিত্ত বাঙালীর জীবনের যন্ত্রণা, কষ্ট, দুঃখ, নিরাশা বিদ্রুপাত্মক ভাষায় তাঁর কবিতা ফুটে উঠে। কাব্য রচনার প্রথম দিকে তিনি গোষ্ঠী ভাবনার দ্বারা চালিত হলেও শেষ দিকে হয়ে উঠেছিলেন শিক্ষক। কবিকে শিক্ষকরূপে আমরা দেখতে পাই তাঁর 'যতদূরেই যাই' 'কালমধুমাস' 'এই ভাই' 'একটু পা চালিয়েভাই' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে।

কিশোর কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতাতেও দেখা যায় মানুষের নানান সমস্যা। বঞ্চিত, শোষিত, লাঞ্ছিত মানুষের যন্ত্রণাক্লিষ্ট জীবনকে তিনি অদ্ভুতভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর কবিতায়। কবিতার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন দেশকে, কালকে, ইতিহাসকে, রাজনীতিকে। বলা যায় বাংলা কবিতার গভীরে খুব কম বয়সেই প্রবেশ করতে পেরেছিলেন জীবনের যন্ত্রনাময় অভিজ্ঞতা নিয়ে। বামপন্থী লেখকের আর একজন কবি অরুণ মিত্র। যিনি মানুষকে স্বীকার করে মানুষের কথা বলেন, তাদের জীবন যন্ত্রণার কথা বলেন, প্রতিমুহূর্তে জীবনের সঙ্গে লড়াই করে কীভাবে

বেঁচে থাকতে হয় সেকথা বলেন, তাঁর কবিতা লেখার মূল বিষয় হল স্বপ্ন, লড়াই, সাম্যবাদী দর্শন। ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনাকেই তিনি কবিতায় কাজে লাগিয়েছেন। জীবনের কঠিন আঘাতে কবি মনে যে মৃদু কম্পনের সৃষ্টি হয় তা প্রকাশ করার জন্যই লেখা হয় কবিতা একথা তিনি বিশ্বাস করতেন। তাঁর কবিতায় আছে এক অদ্ভুত নান্দনিকতা।

মার্কসবাদী প্রভাবকে কিছুটা অন্যভাবে অস্বীকার করেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। লোকজ ঐতিহ্যকে কবিতায় তুল ধরেন। মার্কসবাদীদের প্রগতি আন্দোলনকে ধীক্কার জানান, তাঁর মতে ঃ

"চল্লিশের প্রগতি সাহিত্য প্রথম থেকেই আমার কাছে খণ্ডিত এবং যান্ত্রিক বলে মনে হয়েছে। বাংলা কবিতায় শ্রেণী সচেতনতা অথবা সাম্যবাদের ভাবনাটা চল্লিশের কবিরাই প্রথম আনেন নি। গোবিন্দ চন্দ্র দাস, সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, বিজয়লাল, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অনেক দিন আগেই আমাদের কাছে ঐ বার্তা বয়ে এনেছেন। .... আমার কবিতা কোন দিনই চল্লিশের প্রগতিশীল কবিতা বা কবিদের কাছ থেকে অন্ন বা জল আহরণ করেনি। বরং আমি নিজের কবিতাকে যতটা বুঝি, আমার কবিতার শিকড় অন্যখানে।[৯]

তখনের প্রগতি ভাবনার প্রতি কবির কোনও শ্রদ্ধা ছিল না। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি মার্কসবাদীদের উপেক্ষাও তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি মেনে নিতে পারেন না প্রগতির চলনসই ধারণাকে। তার কবিতায় তরবারির মতো ঝলসে ওঠে সময়, মানুষ, জন্মভূমি, দেশজ ঐতিহ্য। যেন মাটি আর জলের 'আদিম উৎস থেকে উঠে আসা' তাঁর কবিতা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কবির কবিতাকে চিহ্নিত করা যাবে না। তিনি ভেঙে ফেলেন কুসংস্কার ও পুরাতন কাব্যরীতি। কাস্তে কবি দিনেশ দাস, বিমল চন্দ্র ঘোষ, অন্নদা শঙ্কর রায় ও অসীম রায়ের কবিতায় শোনা যায় একক মানুষের প্রতিবাদের সুর।

অরুণ কুমার সরকার 'তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী' গ্রন্থে 'চল্লিশের চোখে চল্লিশের কবিতা' আলোচনায় বলেন চল্লিশের কবিরা সমাজসচেতন। সুকান্ত ভট্টাচার্য, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মণীন্দ্র রায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেশ গুহ প্রমুখদের সাম্যবাদী ভাবনা আক্রমণ করলেও ওঁরা গুরুত্ব দেন বিষয়ের উপর। এঁদের প্রায় প্রত্যেকেই সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতি নির্ণয় করতে উৎসাহ দেখিয়েছেন:

"..... চল্লিশের কবিদের অনেকটা শক্তি রাজনীতির

সেবায় ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। এর জন্য অবশ্য
আফসোস করার কারণ দেখছি না। মাতৃভূমির

পরাধীনতা, বিশ্বজোড়া যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এবং দুর্নীতির মধ্যে থেকে কোনো যুবকের পক্ষেই সেদিন চোখ বুজে ধ্যান করা সম্ভব ছিল না। সন্দেহ নেই যে কাব্য রচনার আবহাওয়ায় শুধুমাত্র কবিতার জন্য কবিতা লেখার সুযোগসুবিধা প্রকৃত পক্ষে আজকালকার যুবকরাই উপভোগ করছেন। শুনলে অবাক লাগবে যে চল্লিশের দশকে দশজনের মধ্যে নয়জন সমালোচকই কাব্যবিচার করতেন কবিতার মধ্যে শতকরা কত ভাগ সমাজ চেতনার দেখা পাওয়া যাচ্ছে তার নিরিখে" (১০)

মানসিক মূল্যবোধ যেখানে নেই, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের যেখানে ছেদ ঘটেছে এই রকম ভয়াবহ শোচনীয় পরিস্থিতিতেও কবি অরুণকুমার সরকার কবিতায় মিলিয়ে দিতে পেরেছেন ফর্মের সঙ্গে বিষয়কে। নস্টালজিক মনোভাব নিয়ে মানুষকে তার ইচ্ছে খুশি পথ দেখিয়ে নানা রকমের বাধা বিপত্তি এড়িয়ে ঘরমুখি হতে সাহায্য করেছেন।

ওই সময়েই বেশ কয়েকজন কবি অন্তর্মুখীন কবিতা রচনা করেন। অবশ্য সমাজ সচেতন কবিতাকে পাশে রেখে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন অরুণকুমার সরকার, অরুণ ভট্টাচার্য, অশোক বিজয় রাহা, গৌরিকিশোর ঘোষ, চিত্তঘোষ, জগন্নাথ চক্রবর্তী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নরেশ গুহ, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখরা বামপন্থী কবি ছিলেন। তবুও তাঁরা ছিলেন সমাজ সচেতন। সুনীলচন্দ্র সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হরপ্রসাদ মিত্র, অরুণ ভট্টাচার্য, অশোক বিজয় রাহা প্রমুখ কবিগণ তাঁদের কবিতায় মিশিয়ে দিতে পেরেছেন সমাজ সচেতনতার সঙ্গে অন্তর্মুখীনতাকে, রূপ আর বিষয়কে কবিতায় রেখেছেন একই সঙ্গে। রোমান্টিক মনোভাবকে কবিতায় স্থান দিয়েছেন নরেশ গুহ, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা। সমাজচেতনার সঙ্গে একধরণের দার্শনিকতাকে যুক্ত করে দিয়েছেন রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন, হরপ্রসাদ মিত্র প্রমুখ সমাজ সচেতন কবি। প্রত্যেকের থেকে আলাদা এবং জটিল রমেন্দ্রকুমার আচার্য চৌধুরীর কবিতা, তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গভীর মননশীলতারও।

চল্লিশের সাম্যবাদ, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ, সমাজ মনস্কতা এবং রাজনীতি নির্ভর কবিতার

পাশাপাশি শুরু হয় রোমান্টিক কবিতা। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা। এই পত্রিকা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশের কবিদের শুদ্ধ কবিতার চর্চা বেড়ে যায়। বাংলা কবিতার ইতিহাসে এই শুদ্ধ কবিতার নাম হয় নতুন রোমান্টিক কবিতা। সময়টা ছিল অত্যন্ত সংকটজনক। ভারতবর্ষ সেই মাত্র স্বাধীনতা লাভ করেছে। স্বাধীনতা লাভের পর দ্বিখণ্ডিত ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের সময়। হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গার মধ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ টিকে থাকার চেষ্টা করেছে। পাকিস্তান থেকে ভারতবর্ষে আগমণ ঘটে হিন্দু ও শিখদের। ভারতবর্ষ থেকে মুসলমানরা প্রবেশ করে পাকিস্তানে। সীমান্ত অঞ্চলগুলিতে উপদ্রব বেড়েই চলে, উদ্বাস্তুদের ওপর চলে অত্যাচার। পূর্ববাংলা ও পশ্চিমপাঞ্জাবে হিন্দু ও শিখদের ওপর অত্যাচারের পাশাপাশি রাজস্থান, বিহার, দিল্লী সহ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে মুসলমানদের ওপরও অত্যাচার চলে। সেই সময় শুরু হয় অজন্মা। ফলে উৎপাদন হ্রাস হয়। কাঁচা মাল ও শিল্প দ্রব্যের ঘাটতি দেখা দেয়। অসংখ্য উদ্বাস্তুর আগমনে খাদ্যাভাব ঘটে।

এই রকম শোচনীয় পরিস্থিতিতে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা যেখানে ভবিষ্যৎ বাংলা কবিতার গতিপথ তৈরী হয়।

চল্লিশের কবিতা তিরিশের সংকটজনক ও ভয়াবহ পরিস্থিতিকে বাদ দিয়ে এক স্বপ্নের স্বদেশভূমি তৈরী করেছে। আর পঞ্চাশের দশকের বাংলা কবিতা স্বাধীনতা পরবর্তী রক্তস্নান সিক্ত ভারতবর্ষে নিয়ে আসে এক নতুন উত্তেজনা। যার সঙ্গে কিছুটা তুলনা করা যায় 'কল্লোল' এর। 'কল্লোল' (১৯২৩) কিন্তু বাস্তব দিক নিয়েও চিন্তা ভাবনা করেছে। আর 'কৃত্তিবাস' (১৯৫৩) জীবনের গোপন দিককে খোলাখুলি ভাবে সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। পঞ্চাশের কবিরা কবিতায় প্রেমকে শরীর থেকে আলাদা করে দেখিয়ে সুন্দর কবিতা রচনা নয় বরং শরীরী প্রণয়কে কবিতায় তুলে ধরাই শ্রেষ্ঠ বলে মনে করেছেন।

বুদ্ধদেব বসু পঞ্চাশের দশকের কবিদের উপর সর্বগ্রাসী ছায়া ফেলেন। এ প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় লেখেন :

> "১৯৫৩ সাল, বুদ্ধদেব বসুর শ্রেষ্ঠ কবিতা
> সবেমাত্র বেরিয়েছে। ইন্দ্র দুগারের আঁকা
> কলকা দেয়া নয়নাভিরাম প্রচ্ছদ, ভেতরের
> মসৃণ সুগন্ধ পৃষ্ঠাগুলি পরিপূর্ণ

হয়ে আছে রাশি রাশি সরল সুন্দর
আবেগময় কবিতায়। সদ্য যৌবন প্রাপ্ত
একটি বালককে অভিভূত করেছিল
এই সব। পাতা উলটে যেখানেই চোখ
পড়ে, আটকে যায় দৃষ্টি। অদৃশ্য কিন্তু
স্পর্শগ্রাহ্য একটি মেয়ের অস্তিত্ব সে
টের পায়, যে তার অনালোকিত অনিশ্চয়তাময়
ভবিষ্যতের দিনগুলি জুঁই আর বকুল ফুলে
ভরে দেবে। কী ভাল যে তার লাগে, সে
বলতে পারে না। ... বয়ঃসন্ধির জ্বালা ও
যন্ত্রণা এবং যৌবনের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ
তাঁর কবিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।
বাংলাদেশের সব যুবকদের হয়ে বুদ্ধদেব বসু
তখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুন্দরীকে প্রেম
নিবেদন করছেন।" [১১]

বুদ্ধদেব বসুর নারীবন্দনা বা নারীদেহ কামনা, শিল্পের জন্যই যে শিল্প এই কলাকৈবল্যবাদ পঞ্চাশের দশকের তরুণ কবিদের গভীরভাবে আকৃষ্ট করে। তরুণ সান্যাল, তুষার চট্টোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিগণও প্রেমের কবিতা লেখার ক্ষেত্রে বুদ্ধদেব বসুকে অনুসরণ করেন। দর্শন বিরোধী কবি ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। তিনি বলেন যাঁরা পঞ্চাশের কবি তাঁরা অনেকেই তাঁর 'যে আঁধার আলোর অধিক' গ্রন্থটিকে হৃদয়ঙ্গম করেন।

বিষ্ণু দে বা জীবনানন্দকে তাঁরা অনুসরণ করেন না। যদিও তাঁরা লিরিক পছন্দ করতেন তবু বাদের খাতায় রাখলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুকুমার রায় প্রমুখ কবিদের। পুরোপুরি নিয়ে নিলেন বুদ্ধদেব বসুকে। এ প্রসঙ্গে অরুণকুমার সরকার মন্তব্য করেন যে এই সময়ের যুবকেরা কবিতার জন্য কবিতা লেখার যে সুযোগ সুবিধার দরকার তা তাঁরা ভালোভাবে উপভোগ করছেন, আরো বলেন মনের ভেতরে যদি অসুখ না থাকে তাহলে কবিতা লেখা যাবে না। এখানের প্রত্যেক কবির মধ্যেই তা উপস্থিত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পঞ্চাশের কবিদের কবিতার প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেন। [১২]।

পরবর্তীকালে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের সমকালীন কবি জ্যোতির্ময় দত্ত তাঁর এই যুক্তিকে মেনে নিলেন না। তিনি তার খণ্ডন ঘটিয়ে বলেন :

"কবিতাগুলি পড়বার পরও বিব্রতবোধ
করছি .....। পূর্বগামীদের আধুনিকতার
বদলে এঁরা নতুন কোনো আধুনিকতা
আনেন নি, তাঁদের ভাষা চেতনার বদলে
নতুন কোনো চেতনার জন্ম দেননি ; এঁদের
কবিতার ধারণা জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত,
অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু বা
বিষ্ণুদের ধারণা থেকে স্বতন্ত্র নয়।
দুঃসাহসিকতা এবং বয়সোচিত বিদ্রোহের
বদলে এঁরা সমাজিক ছাঁদ নির্বিবাদে
মেনে নিয়েছেন .....
..... এঁদের কাব্যাদর্শের বদলে আমরা
নিজেদের হয়ে কোনো নতুন শিল্প ধারণার
জন্ম দিই নি। বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্র দত্তের
আধুনিকতা হয়তো আমার বয়সের
কবিদের কাছে এখনো অত্যাধুনিক। শিল্পে
এখনো আমরা হয় 'সাম্যবাদী' নয়
'আনন্দবাদী'। [১৩]

জ্যোতির্ময় দত্তের এ লেখা প্রকাশিত হয় 'আাধুনিককাল এবং বাংলা কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধের আকারে,১৯৫৬ সালের 'কবিতা' পত্রিকায়। তবে কবির সমস্ত যুক্তিকে মেনে নেওয়া না গেলেও কিছু কিছুকে মানতেই হয়।

পঞ্চাশের কবিদের কবিতায় তিরিশের কবিদের রোমান্টিকতা ও নৈরাশ্য বোধের স্পর্শ ছিল. তারপর সে স্পর্শ বাংলা কবিতাকে নিয়ে গেল চূড়ান্ত পর্যায়ে। এই দশকেই 'সমাজবাদী' কবিতার তুলনায় 'আনন্দবাদী' কবিতা বহুদূর এগিয়ে গেল। ধনঞ্জয় দাশ, মোহিত চট্টোপাধ্যায়,অমলেন্দু গুহ, শিশিরকুমার দাশ, রাম বসু, সিদ্ধেশ্বর সেন প্রমুখ কবিগণ তাঁদের কবিতায় ত্যাগ করেছেন বিপ্লবকে। অমলেন্দু গুহ – 'লুইতপাড়ের গাথা'-তে লড়াইবাজকে

মেরে ফেলার পরিকল্পনা করেছেন নখে নখ দিয়ে টিপে। শিশিরকুমার দাশ তাঁর 'জন্মলগ্ন' কাব্যগ্রন্থের ভূমিকাতে হতাশা জড়ানো আকাশে সূর্যোদয়ের কথা বলেছেন যে সূর্য ওঠার দিকে কবি 'শুকতারার' মতো তাকিয়ে থাকতেন।

কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর কবিতায় মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন 'সমাজবাদ' ও আনন্দবাদ'কে। একসময় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর কবিতায় খুঁজে পান জীবনবোধ উজ্জ্বলতর চেতনা। 'কৃত্তিবাস' তাঁকেই সাদরে গ্রহণ করে নেয় 'তরুণ কবিদের প্রতিভূ' হিসেবে। 'সমাজবাদ ও আনন্দবাদ' এই দুই মেরুতেই ছিল শঙ্খ ঘোষের অবাধ যাতায়াত। পরে ১৯৭৪ সালে এ প্রসঙ্গে তিনি 'কবিতার আমি' প্রবন্ধ লেখেন :

"একদিন কবিতার কাছে দাবী করা হয়েছে
যে সে বদলে দেবে সত্যতার মুখশ্রী,
কবির দায়িত্ব প্রায় যেন সন্তের, নেতার
কিন্তু আজ আর সেই দায়িত্বের উঁচু মঞ্চে
নন তিনি। আজ তিনি সকলের সঙ্গে
পথ চলবেন হেঁটে, সকলেরই দিকে
সহজভাবে চোখে চোখে তাকাবেন তিনি,
সকলেরই আকাঙ্খা বা দীনতার সমভাক্
তিনি- কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর কবিতা
হয়ে উঠবে তাঁর ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করে
তুলবার আয়োজন মাত্র, এক কবিতা
থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছানো তার
কাছে এক আমি থেকে আরেক আমিতে
পৌঁছানোর মতোই তাৎপর্যময়। [১৪]

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মধ্যেও দেখা যায় এই যুগ্মতা। ১৯৬২ সালে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্বন্ধে কবি শঙ্খ ঘোষ লেখেন :

"কোনো মেফিস্টোফিলিস তাঁর সিঁড়িকে
রুদ্ধ করে দাঁড়াতে পারে না, কেননা
যৌবনবাউল এই কবি 'বুকের ভিতরে গন্ধরাজ'
লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন 'এই দেখো করপুটে

একটি গন্ডুষ / বিশ্বাসের জল, তুমি পান করো, আমি
জল না খেয়ে মরব।' যখন 'ধিকিধিকি
সন্দেহের আগুনে শহর / জ্বলে যায়' এই কবি
তখন দুঃখ আস্বাদের অন্য অর্থ খুঁজেপান,
শুদ্ধ পরিশুদ্ধ হয়ে যেতে চান ঐশ্বরিক
অসন্তোষে, প্রেমে। কিন্তু সেজন্যে এমন মনে
করা ভুল যে পারিপার্শ্বকে উপেক্ষা করেন
তিনি বরং তাঁরই কবিতার চিত্রমালায়
সবচেয়ে বেশি প্রকীর্ণ দেখতে পাই
সর্বাবয়ব বাংলা দেশ, 'সমস্ত আকাশ
যেন মুখরিত সাজ্জাদহোসেন থেকে
শুরু করে 'বুকজল নৌকোর গলুই
পর্যন্ত ভেসে আসে তাঁর রচনায়।
বর্হিজীবনকে সৌন্দর্যে উন্নীত করে
নেবার মন্ত্র তিনি জেনেছেন, চর্তুদিকের
সর্বানাশের মধ্যেও 'অটুট আলীঢ় ভঙ্গীতে'
তাঁর সুদেষ্ণাকে দেখতে পান তিনি। 'কবিতার
সূচনা আনন্দে আর পরিণাম প্রজ্ঞায়' ফ্রস্ট
– কথিত কবিতার এই সূত্রটিরও তাঁর রচনা
প্রসঙ্গেই মনে পড়ে আমাদের। কিন্তু আনন্দ
ও প্রজ্ঞার এই পথ দুরূহ পথ আর সে জন্যেই
হয়তো অলোকরঞ্জনের কবিতাকে আজ একগুচ্ছ
ব্যতিক্রম বলে মনে হয়। [১৫]

কবি শঙ্খ ঘোষ আলোক সরকার সম্বন্ধে বলেন ঃ

"শুদ্ধতার এই সূত্রে দ্বিতীয় একটি নাম মনে
পড়ে, আলোক সরকার। এই এক অনতিলক্ষ্য
কবি, খুব নিভৃত উচ্চারণে তাঁর ভালোবাসার
জগৎ রচনা করে যান, 'সমস্ত গোধূলিবেলা

একই কথা' বলে যেন প্রণয়িনীরা ধীর
পায়ে চলে যায়। আলোকের কবিতাবলী
যেন ভিন্ন ভিন্ন কবিতাই নয়, তাঁর সব
রচনাই যেন এক বড় রচনার অন্তর্গত,
যা ক্রমাগতই রচিত হয়ে চলেছে ধূসর
বর্ণে, প্রকৃতির ছবি সেখানে ফিরে ফিরে
আসে যেন ধূসর কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা,
আর তাঁর শব্দ ব্যবহারের আপনরীতিও
তাঁকে এক গোপন আবরণের মধ্যে রেখে
দেয়, ...। [১৬]

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আলোকসরকার সম্পর্কে কবি শঙ্খ ঘোষের মতামতকে গ্রহণ করা যায়। আলোক সরকার কবিতার মধ্যে দেখিয়েছেন নির্জনতাকে। নিজের ভালোলাগা জগতের মধ্যেই অতি রোমান্টিক হয়ে ওঠেন অরবিন্দ গুহ। পরবর্তীকালে শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, শরৎকুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণও এই একই পথে যাত্রা করেন।

পঞ্চাশের দশক ও কবিগণ সম্পর্কে কবি শঙ্খ ঘোষের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

"মাঝখানে অনেকদিন আমরা সৌম্য আয়তনের
চতুর্ধারে ঘুরেছি, মনোরম উদ্যান কিংবা
পথের ধূলোয়। কখনো শৌখিন অবসর,
কখনো চতুর বক্রতা, কখনো প্রমত্ত আহ্বান,
ক্বচিৎ বা ছিন্ন রক্তপাতে ভরে গিয়েছে কবিতা।
এর মধ্যে এক রকম তৃপ্তি ছিলো হয়তো, যাকে
বলা যায় ছোটো ছোটো সম্পূর্ণতার তৃপ্তি,
কেননা কবিতার জগৎকে মাঝখানে অনেকদিন
দেখেছি বহির্জীবনে ঘূর্ণ্যমান, বহির্জীবনের
রূপে অথবা তার রূপহীনতাই, যেন সে

জীবন নামক আদিম অরণ্যের মধ্যে প্রবেশের
পথ ভুলে গিয়েছে।
কিন্তু এখন বিগত কয়েক বছরে, কবিরা
যেন আবার দুঃসাহসী অনুপ্রবেশে প্রস্তুত।
অন্তত অনেক কবি যাঁরা কেবল এই কারণেই
আর্ত বিচলিত যে অরণ্যের বাইরে আর নন
তাঁরা, এখন তাঁরা রহস্যের মধ্যে যেন প্রবিষ্ট।" [১৭]

সব কিছু চুরমার করে ভেঙে গুড়িয়ে দিতে চান পঞ্চাশের কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। দুঃসাহসী ভয়ঙ্করের মাঝে পাগলের মতো ছুটে যেতে চান তিনি। তাঁর বিশ্বাস মহাসর্বনাশে। শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষ তাঁর একই প্রবন্ধে লেখেন :

"সমস্ত চূর্ণ করে দিতে যেন এগিয়ে
আসেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়, কেন না,
'আমি মুক্তি মানে বুঝি / তোমার বুকের
পরে বসে থাকা : গায়ে থাবা গুঁজি / তোমার জগতে
যেন কুমোরের মতন গম্বুজ'। এই তাঁর শিল্পের
অভিজ্ঞতা, এই এক স্পর্ধিত ভয়ঙ্কর তার মধ্যে
উন্মত্ত ছুটে যাওয়াতেই তাঁর বিশ্বাস। বস্তুত
তিনি বিশ্বাসহীন নন, এক মহাসর্বনাশেই
তাঁর বিশ্বাস, ওই তাঁর অরণ্যের ছবি।
বিশ্বাসহীনতার এই ভয়াল বিশ্বাসে শক্তি
এখন আর একাকী নন, সাম্প্রতিক কবিতার
একটি ধারাই এই বিশিষ্টতায় চিহ্নিত হয়ে
উঠেছে, 'নামহীন আঁধারে অস্তিত্ব ভ্রষ্ট।' [১৮]

স্মৃতি, প্রত্যাখান, আত্মপীড়ন ও বিদায়ের প্রতিধ্বনি শোনা যায় পঞ্চাশের কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতায়। শেষ পর্যন্ত তিনি কখনোই পৌঁছাননি অস্তিতে। তাঁর কবিতায় চলে অস্তি ও নেতির লড়াই।

সেই মুহূর্তের বাংলা কবিতা যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতে ওই সময়ে কবিগণ নিজেদের নিজের মতো করে দেখতে পরেছেন। আত্মরতিতে নিমগ্ন হয়েছেন বিনয় মজুমদার, দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছেন উৎপল কুমার বসু। সাবলীল ভাবে রোমান্টিক হয়ে উঠেছেন শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়।

শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় পাঁচের দশকের কবিদের কবিতার আঙ্গিক ও বিষয় নিয়ে লেখেন ঃ –

"কবিতার রীতির দক্ষতা বা শৈলী এঁরা
অনায়াসে অবহেলায় ফেলে ছড়িয়ে যেতে
পারবে। এমন পরস্পর বিরোধী কাব্য ধর্মও বাংলা
সাহিত্যে দেখা যায়নি কখনও। এই তীব্র, উদাসীন,
উন্মত্ত, ধীমান, ক্রুদ্ধ, সম্ভ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, শান্ত, ভয়ঙ্কর, মগ্ন,
চতুর, সৎ, ভূতগ্রস্থ, ধার্মিক
ও অতৃপ্ত কবিদের সমারোহ আধুনিককালের
পৃথিবীর, তাবৎ কাব্যাদর্শকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে
কেবলমাত্র কবিতার জন্য বেঁচে থাকা ও সকল সময়
কবিতার মধ্যে অবস্থানের সঙ্কল্প বুঝিবা নূতন।" [১৯]

প্রত্যেকটি মুহূর্তকে কবিতার মধ্যে রেখে কবিতার জন্য বেঁচে থাকা মনোভাব কবিতাকে যেমন লঘু মানের করে দেয় তেমনি কবি জীবনও হয়ে ওঠে খুব লঘু মাপের। ব্যভিচার, মদ্যপান, হৈ হুল্লোড় তখন হয়ে উঠেছিল কবিতা নির্মাণের প্রধান অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবর্ষে তাই প্রকাশিত হল 'কবিতা দৈনিক' আর 'দৈনিক কবিতা' [২০]। ঘন্টায় ঘন্টায় কবিতা ছাপার আকারে বেরোতে থাকল সুশীল রায় ও অন্যান্যদের সম্পাদিত পত্রিকা 'কবিতা-ঘন্টিকী'তে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মতে ঐ সময়ে কলকাতায় কবি ছাড়া কোনো মানুষ ছিল না। এবং প্রত্যেক কবিই ছিলেন সশস্ত্র। তাই বিশাল উত্তেজনা ও ডাক শোনানোর অনুভূতিকে সেই সময় উপেক্ষা করা যায় না। তবে এই চটকদারি তাৎক্ষণিক কবিতাগুলো ঐতিহ্য থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছিল, এমনকি মানুষজনের সুখ দুঃখ থেকেও এই সময়ের কবিতা ছিল বহু দূরে। তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য ছিল কবিতা হবে কবিদের জীবন যাপনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্টে জড়িত।

এই মন্তব্য থেকে প্রত্যেকেই উপলব্ধি করতে পারেন যে বাংলা কবিতার ইতিহাসে প্রবেশ করতে চলেছে এক নব্য আধুনিকতাবাদ।

ত্রিশের কবিরা রবীন্দ্র প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিলেন, চল্লিশের কবিরা ছিলেন সমাজবাদী সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী। পঞ্চাশের কবিরা সাহিত্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন ভাসমান। তাঁরা যূথবদ্ধ হয়ে ছিলেন বন্ধুত্বের টানে। ষাটের দশকে এসব কিছুই ছিল না। ষাটের দশকের শুরুতেই কলকাতায় পা রাখেন আমেরিকার 'বিট' আন্দোলনের প্রবক্তা অ্যালেন গিনস্‌বার্গ। তাঁদের মতে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকা মানে অতীতও নেই, ভবিষ্যতও নেই। খাঁটি কেবল বর্তমান মুহূর্ত। আত্মা, পাপ, বিশ্বাস বলে কিছু নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথীবীতে যে ভয়ঙ্কর রূপ দেখা দেয় তা থেকেই আসে পশ্চিমের শিল্পীদের নিজস্ব যন্ত্রণা। আর তারই প্রতিফলন ঘটে 'বিট' আন্দোলনে, এই সাহিত্যিক আন্দোলনের কবিরা তাঁদের কাব্যে তুলে ধরেন মদ্যপান, ড্রাগ, অশ্লীলতাকে। স্বীকার করেন না যুক্তি, নিয়ম এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মনন ও উত্তরাধিকারকে।

বাংলা কবিতায় এই 'বিট' আন্দোলনের সূত্র ধরেই আসে 'হাংরি' আন্দোলন। মলয় রায়চৌধুরী ছিলেন এই শিল্প আন্দোলনের পুরোধা। কৃত্তিবাস পত্রিকার একটি অংশে এই বিট আন্দোলন কিছুটা আলোড়ন তুলেছিল। তাই মলয় রায়চৌধুরীর সঙ্গে সঙ্গ দিয়েছিলেন 'কৃত্তিবাসে'র জ্যোতির্ময় দত্ত, উৎপলকুমার বসু, বিনয় মজুমদার, শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কবিগণ এবং তার কিছু পরে এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন শৈলেশ্বর ঘোষ, দেবী রায়, শম্ভুরক্ষিত, সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়, সুবিমল বসাক প্রমুখ কবিগণ। 'হাংরি জেনারেশন' নামক বুলেটিনে ১৯৬২ সালের এপ্রিল মাসে মলয় রায়চৌধুরী লেখেন :

"কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে
আত্মস্থ। সে আর জীবনের সামঞ্জস্য
কারক নয়, অতিপ্রজ অন্ধবল্মীক নয়,
নিরলস যুক্তি গ্রন্থন নয়। এখন এই সময়ে
অনিবার্য গভীরতার সন্ত্রস্ত দৃক ক্ষুধায়
মানবিক প্রয়োজন এমন ভাবে আবির্ভূত
যে, জীবনের কোনো অর্থ বের করার

প্রয়োজন শেষ। এখন প্রয়োজন অনর্থ
বের করা, প্রয়োজন মেরু বিপর্যয়,
প্রয়োজন নৈরাত্মসিদ্ধি, প্রাগুক্ত
ক্ষুধা কেবল পৃথিবী বিরোধীতার নয়,
তা মানসিক, দৈহিক এবং শারীরিক।
এ ক্ষুধার একমাত্র লালনকর্তা কবিতা,
কারণ কবিতা ব্যতীত আর কি আছে
জীবনে। মানুষ, ঈশ্বর, গণতন্ত্র
এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গেছে।" [২১]

মলয় রায়চৌধুরীর মতে কবিতা সৃষ্টির প্রথম শর্তই হল শিল্পের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা। তিনি বলেন কবিতা মানবিক এবং শরীরী ক্ষুধার কথা বলবে, ঐতিহ্যকে অস্বীকার করবে, প্রতিদিনের ভাষায় রচিত হবে কবিতা। চিরাচরিত প্রথা লুপ্ত হয়ে যাবে। গদ্য এবং পদ্যছন্দ থাকবে না। হাংরিদের ইস্তাহারে ১৪টি শর্ত প্রকাশিত হয়। [২২] এই ১৪টি শর্তের মূল কথাই হল 'সম্পূর্ণ অহং এর ক্ষমাহীন প্রকাশ।'

স্বাধীনতার পরবর্তী মানুষের জীবন হয়ে উঠেছিল স্বপ্নহীন। দারিদ্র আর বেকারত্বের যন্ত্রণায় ছট্‌পট করছিল প্রত্যেকেই। এই মুহূর্তে বিদেশ থেকে আসা আন্দোলনকে আনন্দের সঙ্গে কবিরা গ্রহণ করেন। এ প্রসঙ্গে শৈলেশ্বর ঘোষ বলেন, 'হাংরি' বলতে গ্রাস নয়, অবক্ষয়কে বোঝায়। বোঝায় সত্যের ক্ষুধাকে, যে ক্ষুধা বাইরের জীবন ও ভেতরের জীবনের সংঘাতে হয়ে উঠবে স্পষ্ট।

ষাটের দশকের কবিদের কবিতায় বিষয় নয়, প্রধান হয়ে উঠেছে রূপ বা ভঙ্গি। এই ভঙ্গিকেই তাঁরা ধরে রেখেছেন অশ্লীল ভাষায় কবিতা লেখে এর মধ্যে কৃত্রিম দিকটাই প্রকাশ পেয়েছিল বেশি করে। কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন 'যীশুর মদ ও রুটির মতো কবিতা যাঁদের কাছে আছে তাঁদের লেখা আর কোনো দিন থেমে থাকবে না। তিনি আরো বলেন কবিতা লেখা হবে সোজসুজিভাবে হালকা লঘু ভঙ্গীতে। ১৯৪৭ সালের আগে যে শাসন শোষণ চলেছিল স্বাধীনতার পরেও সংস্কৃতির উপর তার প্রভাব পড়ে। এই নতুন ঔপনিবেশিক আন্দোলন মানুষের আসল সমস্যাকে ভুলিয়ে দিয়ে প্রত্যেককে অন্ধকারের গভীরে ডুবিয়ে দিতে

চায়। এই সদর্থক আর নঞর্থকের লড়াইয়ের বাইরে থেকে গেছেন অনেক কবিই। কবি সুধেন্দু মল্লিক এই সময়ের হয়েও ছিলেন কিছুটা মিস্টিক, শান্ত ও তন্ময়। বিনয় মজুমদার যিনি প্রকৃতির এবং মানুষের গভীরে প্রবেশ করেছিলেন। একইভাবে নাম করা যায় বীরেন্দ্র রক্ষিত, রঞ্জিত সিংহ, দীপক মজুমদার, মানস রায়চৌধুরী, শান্তি লাহিড়ী, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিদের।

'হাংরি' আন্দোলন টিকেছিল প্রায় ১৯৭২ পর্যন্ত। হাংরি আন্দোলনের তিন বছর পরে আর এক আন্দোলন দেখা দেয় বাংলা কবিতার জগতে, তা হল ১৯৬৫ তে 'শ্রুতি' কবিতা আন্দোলন। কবিতা থেকে তাঁরা সমস্ত ভাবনা চিন্তাকে মুক্তি দিয়ে শব্দ সাজিয়ে একরকমের শব্দচিত্র নির্মাণ করতে চাইলেন। ষাট দশকে শুরু হল নানামুখী আন্দোলন। ১৯৬৬ তে 'শাস্ত্রবিরোধী' গল্প আন্দোলন, ১৯৬৯ -এ 'কংক্রীট' কবিতার আন্দোলন শুরু হয়। বাংলা ভাষায় একটা দশকের মধ্যে এতগুলো আন্দোলন কখনো দেখা যায়নি। তবে এই আন্দোলনগুলো বাংলা সাহিত্যে তেমন করে আলোড়ন তুলতে পারেনি।

'শ্রুতি' আন্দোলনের কবিরা কবিতাকে চিৎকার নয়, আত্মমগ্ন এবং অন্তর্মুখী করে তুলতে চাইলেন। এই আন্দোলনের তিনটি ইশ্তাহার প্রকাশ পায় ১৯৬৬,[২৩] ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ -এ ।

শ্রুতি আন্দোলন যৌথ কাব্য আন্দোলন, কিন্তু ব্যক্তির স্বাতন্ত্র এখানে লোপ পায় না। কেবলমাত্র বহিরঙ্গ নিয়ে শ্রুতি কবিতা সেজে ওঠে। এসব কবিতার বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ছক বা আকারে মুদ্রণবিন্যাস। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মৃণাল বসুচৌধুরী, পুষ্কর দাশগুপ্ত, সমরেন্দ্র চক্রবর্তী, তপনলাল ধর, গৌরাঙ্গ ভৌমিক প্রমুখ কবিগণ। 'শ্রুতি'র কবিগণ শব্দের দৃষ্টি ও শ্রুতির ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন কবিতায়।

'কংক্রিট' কবিতা আন্দোলন শুরু হয় 'ঈগল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে ১৯৭৯ সালে। এই কবিতা দৃষ্টিগ্রাহ্য, শ্রুতিগ্রাহ্য ও গতিতাত্ত্বিক। এই কবিতার ইতিহাস পুরানো। কবি পনার (১৬৭৪ - ১৭৬৫) ইউরোপে ভাবনির্দেশক বর্ণমালা সৃষ্টি করে 'কংক্রিট' কবিতা লেখার সম্ভাবনার সূচনা করেছিলেন। প্রথম 'কংক্রিট' কবিতার বই 'নক্ষত্রপুঞ্জ' বের করেন সুইজারল্যান্ডের কবি য়ুজিন গোমরিং। ফরাসি কবি মালার্মে এই কবিতা আন্দোলনকে গতি দেন।

বাংলায় 'কংক্রিট' কবিতা আন্দোলনের সূচনা করেন অশোক চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ

মন্ডল। কংক্রিট পর্বে কবিতা হয়ে ওঠে অনেক সহজ ও স্পষ্ট। টাইপরাইটার কবি, পোষ্টার কবিতা, টাইপরাইটার কবিতা কংক্রিট কবিতার মধ্যে পড়ে। 'কংক্রিট' কবিতা আন্দোলনের বক্তব্যকে ঘিরে 'আধুনিক কবিতার বিরুদ্ধে' নামে বই রচনা করেন অশোক চট্টোপাধ্যায়। তিনি বোঝাতে চাইলেন কবিতা কংক্রিট, কবিতা সরল ও স্পষ্ট। এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য বস্তুকে হরফ দিয়ে দৃশ্যময় কবিতা তৈরি করা।

'শাস্ত্র বিরোধী' গল্প আন্দোলন শুরু হয় 'এইদশক' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে। এই আন্দোলনের সময়সীমা ১৯৬৬ - ১৯৮১ পর্যন্ত। এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন রমানাথ রায়, অশিষ ঘোষ, শেখর বসু, অমলচন্দ, বলরাম বসাক প্রমুখ। এই অন্দোলন গুলো হাংরি আন্দোলনের মতো আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে না। এক অস্থির সময়ে 'এক্সপ্রেশনিজম্', ডাডাইজম, সাররিয়ালিজম্, বীট প্রভৃতি আন্দোলনের অনুকরণে এই আন্দোলনগুলি হলেও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিত অনুরূপ ছিল না বলে হাংরি, শ্রুতি, কংক্রিট, প্রভৃতি আন্দোলনকে 'আচারসর্বস্ব' বলে মনে হয়। (জানা, নিতাই,' পোষ্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়' ২০০১ : ২৬ পৃঃ)

"এই সময়ের আরো একটি প্রবণতা
– অ্যান্টি পোয়েট্রি না কবিতা। এরকম কোনো
আন্দোলন গড়ে ওঠে নি, তবুও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়
মানিক চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, ভাস্কর
চক্রবর্তী প্রমুখ হয়তো ভাস্কো পোপা,
নিকানার পাররার'র অনুকরণে আলঙ্কারিক
প্রথা বাদ দিয়ে, হয়তো সময়ের প্রভাবে,
কবিতাকে গড়ে তোলেন খবরের কাগজের
মতো দৈনন্দিন, তথ্যময়, অনায়াস বিবৃতি
সারল্যের ভেতর। তবে এঁদের কবিতার
ছন্দহীনতা এবং বিবৃতিময় মুখের ভাষা
প্রচলিত কবিতার জগতে নতুন এক ব্যতিক্রম।" (২৪)

ষাটের দশকটা ভাঙনের সময়। রাজনৈতিক ভাবে উত্তাল। উদ্বাস্তু সম্যস্যায় জর্জরিত।

তখন খাদ্য সংকট, চিনি সংকটের মতো নানান সমস্যা মনুষকে নাজেহাল করেছে। থাকা - খাওয়ার সংস্থান করতে পারছে না মানুষ। আক্রান্ত হয়েছে নানাদিক থেকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঠান্ডালড়াই, পরমাণু-যুদ্ধের ভয় বৃহৎ শক্তিগুলির অনুন্নত দেশগুলিকে সাহায্য দানের নাম করে কিনে নেওয়ার ইচ্ছা ভারতবর্ষের মানুষকে আতঙ্কিত করেছে। এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ভিয়েতনাম ও কোরিয়ার যুদ্ধ। সাম্যবাদী দল টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেছে। এই দশকের শেষে জাতীয় কংগ্রেসও দু'ভাগ হয়ে যায়। সেই সময়ে গড়ে ওঠে গ্রুপ থিয়েটার, রাস্তার মাঝে গড়ে ওঠে শহীদ বেদী। শেষের দিকে শুরু হয় নক্‌শালবাড়ি আন্দোলন। প্রতিদিন সাধারণ মানুষ, বিদ্যালয় শিক্ষকদের মেরে ফেলা, গ্রন্থাগার পুড়িয়ে ফেলাই ছিল তখনের কাজ। তখন বিকৃত হয়ে পড়ে রাজৈনতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাস্তব। ওই সময়ে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত যুব সমাজের মধ্যে দেখা দেয় ক্রোধ, ঘৃণা এবং ধ্বংস করার প্রবল ইচ্ছা। তাই সমাজের একটা দিক যেমন জড়িয়ে পড়ে বিকৃত উন্মাদনায় তেমনি সমাজের বাকি অংশ নতুন ভাবে আঘাত করে প্রচলিত মূল্যবোধকে। সমাজকে বিষাক্ত করে দেয় সমাজের উঁচু তলার মানুষের ব্যভিচার, সরকারী দমন পীড়ন, দারিদ্র্য, বেকারি, শিল্পের পত্তন। ধীরে ধীরে অবক্ষয়ের দিকে এগিয়ে যায় সমাজ ও সমাজের বুদ্ধিজীবী মানুষ। এইরকম টানাপোড়েনে ষাটের দশকের কবিতা বহুত্ববাদী হয়ে ওঠে। প্রথাগত আঙ্গিক ও রীতিকে ভেঙে নীতিবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। কাহিনীকে সরিয়ে চলে আসে গল্প। পাশাপাশি অবস্থান করে চিত্রকল্প ও বক্তব্য। দার্শনিকতা, বিচ্ছিন্নতা ব্যক্তিকে ঠেলে দেয় আত্মবিস্মৃতির দিকে। রাজনৈতিক আন্দোলন কবিতায় দেশ কাল ইতিহাসকে নিয়ে আসে। এ সময়ের কবিতায় যেমন আছে অস্থির দিক, তেমনি আছে স্বীকারোক্তি।

ষাটের উল্লেখযোগ্য কবি হলেন মণিভূষণ ভট্টাচার্য। তিনি ব্যক্তির সঙ্গে তার সমকালের তথা পূর্বপুরুষের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সম্পর্ক সেই সম্পর্কের কথা কবিতায় তুলে ধরেন। হাজার বছরের ঐতিহ্যকেও কবিতার মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেন। প্রথম থেকেই তিনি ঘরোয়া কথাবর্তা শুরু করেন। সমকালকে অবশ্যই তাঁর কবিতায় তুলে ধরেন। কিন্তু তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন গার্হস্থ্য ভালোবাসাকেও।

এই দশকের কবি বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কবিতায় ধরা আছে ব্যক্তি আর সমাজের টানাপোড়েন। তাঁর কবিতায় আছে যন্ত্রণা আর হিংসাত্মক রাগ। তিনি এক অদ্ভুত জগৎ তৈরী

করেন যে জগতের মধ্যে আছে হিউমার। ব্যক্তি ও সমাজ এই জগতের মধ্যে অবস্থান করে। অপরাধীদের অত্যাচারের, সন্ত্রাসের বিরোধীতা করার জন্য মানুষ যে স্বপ্ন দেখে তা রোমান্টিক মুহূর্তকে ঝাঁকুনি দেয়। কবির কবিতা যে প্রতিকূল সময়ের মাঝখানে দাঁড় করিয়ে মানুষের যান্ত্রিক জীবন যাপনকে আরো বেশি প্রশ্নের মুখোমুখি করে তোলে, তা পাঠক উপলব্ধি করতে পারেন।

পুরোপুরি বাস্তবের, ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে ঐতিহাসিক দ্রষ্টার মতো অতীত ও ভবিষ্যতকে যিনি তীক্ষ্নভাবে নিরীক্ষণ করেন তিনি হলেন ওই সময়ের কবি দেবদাস আচার্য। ভারতবর্ষের শ্রমজীবি দরিদ্র মানুষকে তিনি দেখেছেন গভীর মমতার চোখে। তিনি বিশ্বাস করেন ভারতীয় বিষাদ ও দর্শন মৃত্যুকে জয় করার জন্য ইতিহাসের উপর ছড়িয়ে রেখেছে শোকগাথা ও দুঃখের মতো তথ্য।

জীবনকে বাদ দিয়ে যে কবিতা লেখা সম্ভব নয় একথা বলেন ষাটের কবি রত্নেশ্বর হাজরা। কেননা কবিতার থেকেও বড় হল জীবন। সুতরাং কবিতার জন্য কবিতা লেখা নয়। কবিতা লেখা হয় জীবনের জন্য। তাই তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে আসে জীবনের কথা, সামাজিক চৈতন্যের কথা। নিজের জীবনের সঙ্গে, চেতনার সঙ্গে দুঃখকে মিলিয়ে সামাজিক মানুষ হিসাবে পাঠকের কাছে তিনি হয়ে ওঠেন আত্মসমালোচক।

লোকায়ত জগতের অধিবাসী হলেন সামসুল হক ও মণীন্দ্র গুপ্ত। সামসুল হকের কবিতায় ফুটে উঠেছে নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতার যন্ত্রণা। আবার সামাজিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদও লক্ষ্য করা যায় তাঁর কবিতায়।

মানবপ্রকৃতি ও নিসর্গ প্রকৃতিকে একসূত্রে গেঁথে ফেলেছেন মণীন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিতায়। ধ্যান ও বাসনা দুই'ই উপস্থিত কবির কবিতার মধ্যে। সাম্প্রতিকতার মাঝখানেও তিনি নিখুঁত ভাবে ব্যবহার করেছেন আর্কিটাইপ। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে কখনো কবিতা লেখা সম্ভব নয়। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন আস্থাহীন, পাপবোধের অনুভূতি তাঁর মধ্যে যেমন ছিল প্রবল আবার অন্য দিকে অনাবাদী জমিতে সূর্য বীজ বুনে চাষ করতেও সমানে আগ্রহী। তিনি কবিতায় পৌরাণিক মিথগুলোকেও নিয়ে আসেন।

ব্যঙ্গ বিদ্রুপ, তেজোদীপ্ততা, হিরোয়িক মেজাজ নিয়ে কবিতা লেখেন ষাটের দশকের কবি তুষার রায় ও ভাস্কর চক্রবর্তী। তবে এর পেছনে কাজ করেছিল রাজনৈতিক অস্থিরতা, মানুষের উদাসীন মনোভাব। গৌরাঙ্গ ভৌমিক, পুষ্কর দাশগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত, মানিক

চক্রবর্তীর কবিতায় উঠে আসে জীবনযন্ত্রণা, স্বপ্ন-স্মৃতি ভেঙে যাওয়ার জগৎ। ছন্দ, চিত্রকল্প দিয়ে কবিতায় অদ্ভুত সৌন্দর্য গড়ে তোলেন বঙ্কিমচন্দ্র মাহাত। এই রকম ছোট ছোট ছবি, চিত্রকল্প নিয়ে কবিতা রচনা করেন দেবারতি মিত্র। তঁর কবিতা ইন্দ্রিয়ময়। মানুষ, সময়, বাস্তব আর পরাবাস্তবকে তিনি কবিতায় একাকার করে দিয়েছেন। ষাট দশকের আরো অনেক কবি আছেন যাঁরা আমাদের মোহিত করেন তাঁদের লেখার মধ্য দিয়ে। তাঁরা হলেন কবিরুল ইসলাম, কেতকীকুসারী ডাইসন, তুলসী মুখোপাধ্যায়, প্রভাত চৌধুরী, দেবাশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, গীতা চট্টোপাধ্যায়, বিজয়া মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

সত্তর দশকের যাত্রা শুরু বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে। কবিতা ক্ষেত্রে দায়বদ্ধতার ও আত্মমগ্নতার দশক সত্তর। সেই সময়ের যে টালমাটাল রাজনীতি তাকে বাদ দিয়ে সত্তরের কবিতাকে ভাবা যায় না। এই দশককে অবশ্য অনেকটাই সতর্ক করে দিয়েছে ষাটের দশকের সব অভিজ্ঞতা। তবে বেশি আকৃষ্ট করেছে পঞ্চাশের রোমান্টিক ভাবালুতা। চরিত্রহীনতা, ভ্রষ্টাচার এবং সামাজিক ভাঙন সবই ছিল সত্তরের দশকে।

বাংলা কবিতায় সমাজসচেতন ধারার সূত্রপাত ঘটে চল্লিশের দশকে আর তা সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে সত্তর দশকে পৌঁছে :

> “বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার পরিপ্রেক্ষিতে
> দেখলে দেখা যাবে সত্তর দশকের কবিতা, চল্লিশের
> সমাজে সচেতন, পরিবর্তনপ্রয়াসী প্রথম ধারার
> অন্তর্গত, পঞ্চাশের চূড়ান্ত ব্যক্তিমুখীনতার
> ঠিক পরেই রাজনৈতিক আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে
> বংলা কবিতা দোলকের মতো আবার বিপরীত
> প্রান্তের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। কবিরা
> নিজেকে সমাজ বিচ্ছিন্ন নয় বরং পারিপার্শ্বিকের
> মধ্য থেকে বিচার করেছেন, প্রেমকে নিয়ে
> এসেছেন সমগ্রতায়, পরিবেশের অসহনীয়তার
> পিছনের রাজনীতি অর্থনীতি তাঁদের চেতনায়
> কমবেশি স্পষ্টতা নিয়ে স্থান দখল করেছে।

চার দিকের কলুষতা থেকে শুধু সংকুচিত হয়ে
থাকা নয়, তাঁরা এর মধ্যেকার রাজনৈতিক
ষড়যন্ত্রের রূপটি কিছু কিছু দেখতে পেয়েছেন।
এর মধ্যে আমাদের জীবনধারণ অপরিহার্য জেনে
এক পরিবর্তনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং এই
স্বপ্ন সমষ্টিকে নিয়ে, সমষ্টিগত সংগ্রামের
সেইদিন থেকে চল্লিশের প্রথম ধারার
কবিতা থেকেই এর প্রধান উত্তরাধিকার। [২৫]

ছয়ের দশক বামপন্থী আন্দোলনে উত্তাল। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে। তখনও ঔপনিবেশিক হাওয়ার রেশ কাটেনি। অথচ মানুষ স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে সবপেয়েছির দেশের। কিন্তু বেশিদিন স্বপ্ন দেখা হল না। অচিরেই ভেঙে পড়তে শুরু করল সবপেয়েছির দেশ, নানা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। যেমন খাদ্য আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ট্রামভাড়া বৃদ্ধি আন্দোলন, বাংলা বিহারকে এক করার বিরুদ্ধে আন্দোলন, গোয়া দমন দিউ মুক্তির আন্দোলন ও অন্যান্য নানা রকম আন্দোলন। এই দশকে চীন ভারত আক্রমণ করে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তানের যুদ্ধ বাধে, ভারতের অর্থনীতি বিপন্ন হয়ে পড়ে, ধনতান্ত্রিক পৃথিবী জুড়ে চলে মন্দা। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, বেকার জীবনের নাগপাশে বাঁধা পড়ে ভারতবর্ষ। পথে পথে ভিড় বাড়ে ভিখিরিদের। অন্যদিকে চলে ভিয়েতনামের যুদ্ধ, ফ্রান্সে ছাত্রদের অভ্যুত্থান, ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞ। চলে ১৯৬৩ -এর জুন মাসে খাদ্যের দাবিতে বাংলা বন্‌ধ, এশিয়া-আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় উত্তাল সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলনে একের পরে এক ভাঙন, কালো মানুষদের আত্মমর্যাদার জন্য লড়াই, দারিদ্র্য সীমার গর্তে দেশের ষাট ভাগ মানুষ, ১৯৬৬-এর খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭-র নির্বাচনে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার, ১৯৬৭-র মে মাসে উত্তরবঙ্গের নক্‌শাল বাড়িতে পুলিশের গুলিতে কৃষক মৃত্যুর ঘটনা থেকে নক্‌শাল আন্দোলন, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ইত্যাদি একের পর এক ঘটনা।

চল্লিশের সমাজসচেতন কবিদের কবিতার ধারার প্রসার ঘটে নক্‌শাল বাড়ি আন্দোলনের অভিঘাতে। আবার ষাটের দশকের শেষের দিকের কবিরাও ভাব জগতের প্রাচীন বাঁধন ছিন্ন করে নতুনভাবে কবিতা লিখেছেন এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। সত্তরে নক্‌শাল আন্দোলন

তীব্রতা পায়। নক্‌শালবাড়ি আন্দোলন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে চারিদিকে। শুরু হয় প্রশাসনিক প্রতিরোধ। ভারতবর্ষের কারাগারে বন্দী হয় তরুণ-তরুণীরা। সত্তরের নতুন কবিরা এই ধারার কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছেন। যাঁরা পঞ্চাশের বা ষাটের কবিদের ভাবজগৎকে অনুসরণ করেছেন তাঁরাও শিক্ষা নিয়েছেন নতুনভাবে। যেমন ছিলেন রঞ্জিত গুপ্ত, সব্যসাচীদেব, পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়, নবারুণ ভট্টাচার্য, ধুর্জটি চট্টোপাধ্যায়, বিপুল চক্রবর্তী, সনৎ দাশগুপ্ত প্রমুখরা। একইভাবে ষাটের দশকের শেষদিকে লিখতে শুরু করেন মনিভূষণ ভট্টাচার্য, পার্তপ্রতিম কাঞ্জিলাল, অমিতাভ গুপ্ত, সাগর চক্রবর্তীর মতো কবিগণও। তাঁদের লেখাতে তাঁরা সময়কে ধরে রেখেছিলেন।

যাইহোক এই দশক যত ভয়ংকর হোক না কেন, পরিবর্তনের চিহ্ন রেখে গেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন গ্রামমুখী মানসিকতাকে। এক একটি অঞ্চল থেকে উঠে এসে তাঁরা অভিজ্ঞতাসূত্রে নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে বাংলা কবিতায় স্থান দিয়েছেন। সত্তরের কবিতায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুররিয়ালিস্টিক ভাবনা, রোমান্টিকতার নতুন ধারা এবং দুঃখবাদ। ভারতবর্ষের নিঃস্ব - অসহায় উপবাসী মানুষদের প্রতি সহানুভূতি সহমর্মীতা দেখিয়েছেন :

> "সত্তরের কবিদের অনেকেই গ্রামের বাসিন্দা,
> শুধু বাসিন্দা নয়, একটা গ্রামীণ মুগ্ধতা
> এখনও এদের মধ্যে বেঁচে আছে।
> কবিতায় এঁরা শুধু নিসর্গের বর্ণনা
> ফিরিয়ে আনেননি, যে নিসর্গের
> মধ্যে এঁরা বাস করেন কিংবা যে
> নিসর্গ এঁদের মধ্যে বাস করে
> তাকে কবিতায় ফিরেয়ে এনেছেন
> এঁরা। একটা টাটকা স্বাদ, অন্যতর
> স্বাদ বাংলা কবিতায় পুণরায় রোপিত
> হল। [২৬]

ষাট ও সত্তর দশকের কবিগণ একই সামাজিক ও রাজনৈতিক আবহাওয়ায় বেড়ে উঠেছেন বলে তাঁদের ভাবনাচিন্তা, পারস্পরিক নৈকট্য এবং দূরত্ব প্রায় একই রকমের।

পঞ্চাশের কবিদের যোগ্য উত্তরসূরী কেউ কেউ খুব বেশী সমাজ সচেতন, রাজনীতি নির্ভর আবার কেউ কেউ রোমান্টিক, আত্মমগ্ন। সত্তর দশকের তুমুল লন্ডভন্ড সময়েও পৃথিবীর সমস্ত কোলহল থেকে দূরে সরে গিয়ে যাঁরা সম্পূর্ণ একটি নতুন কাব্যধারা সূচনা করেন তাঁরা হলেন অমিতাভ গুপ্ত, রণজিৎ দাস, শ্যামলকান্তি দাশ, মৃদুল দাশগুপ্ত প্রমুখ। চল্লিশের উচ্চকন্ঠ নয়, পঞ্চাশের রোমান্টিসিজম্ ও মিস্টিকভাবনা নয়, ষাটের বিপ্লব নয়, সত্তরের একমাত্র কবি বীতশোক ভট্টাচার্য যিনি স্বকন্ঠে কবিতাকে অন্য ঘরানায় নিয়ে যান। যাঁর মধ্যে একই সঙ্গে বিরাজ করেছিল তাঁর নিজস্বভাবনা, আত্মনিষ্ঠতা ও রোমান্টিকতা, মিস্টিক ভাবনা।

কবিতার দশক বিভাজন তিনি পছন্দ করতেন না। তাঁর মতে দশক ভেঙে দেওয়া মানে কবির প্রতি যথার্থ বিচার না করা। তিনি বিশ্বাস করতেন কবিতার শক্তিতেই সত্য হয়ে ওঠেন কবি। তাই আত্মস্থ করেছিলেন ভারত বিদ্যা ও বিশ্ববিদ্যার ঐতিহ্যকে। এই ঐতিহ্যের পথ ধরেই তাঁর আধুনিকতার যাত্রা।

সত্তরের কাছাকাছি সময়ে যখন তিনি কবিতা লেখা শুরু করেন তখন একদল কবি উৎসুক হয়েছিলেন সমাজিক ঘটনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াকে দ্রুত প্রকাশ করতে। ওই সময়ে অবশ্য কিছু জন ভালো কবিতা লিখেছিলেন, আর একদল কবি চেয়েছিলেন নৈরাজ্য, নাগরিক ক্লান্তি, গ্লানি উন্মুক্ত ধ্বংসের নষ্টামিকে কবিতায় সহজ করে গড়ে তুলতে। দু-দল লিখেছিলেন বিষয়নির্ভর, গল্পনির্ভর, কবিতা। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য এই দুটো ধারা থেকেই সরে এসেছিলেন। সত্তরের সামাজিক, রাজনৈতিক বিপ্লব চেতনাকে তিনি এড়িয়ে যাননি। প্রতীক রূপকের ব্যবহার করে সমসময়ের যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর কবিতাতে রাগ, প্রতিহিংসা নেই আছে চাপা দম বন্ধ করা আর্ত যন্ত্রণা। তিনি নিজস্বতায় একক, প্রসঙ্গে নতুন এবং মনোযোগের সঙ্গে নিজস্ব ভাবনায় আগ্রহী।

সাতের দশকের জরুরী অবস্থা, বিভিন্ন আন্দোলন, দেশভাগের যন্ত্রণা, যুক্তফ্রন্ট সরকারের উত্থান-পতন, নাশা, এসমা ইত্যাদি নিপীড়ন তাঁর কবিতায় চাপাস্বরে আলোড়ন তুলেছিল। এ নিয়ে তিনি কবিতাও লেখেছেন 'পরিচয়', 'অগ্নিকোণ' প্রভৃতি পত্রিকায়। জঙ্গল সাঁওতালকে নিয়ে তিনি 'তীরধনুক' নামে একটি কবিতাও লিখেছেন। সেই সময়ের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র তাঁর প্রথম পর্বের 'তিনজন কবি' (শরিকি সংকলন), 'শিল্প', 'অন্যযুগের সখা' কবিতায় ফুটে উঠেছে। প্রথম পর্ব বলতে বোঝায় ১৯৭৬ পর্যন্ত লেখার পর্যায়। প্রথম যৌবনে

সাময়িক হলেও একসময়ে তিনি নকশাল আন্দোলন, কখনোও বা বামপন্থী আন্দোলনে আগ্রহী ছিলেন।

জ্বলদর্চি পত্রিকার জানুয়ারি–ডিসেম্বর ২০০৫ সংখ্যায় বিপ্লব মাজীর "বীতশোক, যতদূর মনে পড়ে" রচনাটি পড়ে জানা যায়[২৭] — বিপ্লব, বিদ্রোহ, প্রতিবাদ প্রভৃতি বিরূদ্ধবাদী ভাবনাগুলি বীতশোকের কবিতায় কখনও কখনও অবান্তর মনে হয়েছে। আবার শিল্পের প্রয়োজনে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও – অনেক সময় বিপ্লবীদের কবিতা অনুবাদে, পাঠে বা তা নিয়ে আলোচনায় তাঁকে আগ্রহী হতেও দেখা গেছে। নিজস্ব জীবন ও মৌলিক ভাবনাগুলিকে তিনি ইজম্ থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে রাখতে চেয়েছেন একথা যেমন সর্বৈব সত্য, তেমনি একই ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি বামপন্থী শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলন ও প্রতিক্রিয়াশীল শিল্প সাহিত্য আন্দোলনের সঙ্গে সহমত হতে পারেননি।

শাঁখের করাতের মতো কার্যকরী ভাবনা দিয়ে উভয় গতির ধারাকে সমালোচনা করতে চেয়েছেন। যে কোনো বিষয় ও বস্তুর না-বাচক দিকটাতেই শুধু প্রাধান্য দিয়েছেন – এমন কথা বলা যাবে না। বরং ভাষার খেলায়, শিল্পের আনন্দে তিনি নিত্য ডুবে থাকতে চেয়েছেন।[২৭] সমালোচক ঠিক কথাই বলেছেন। কবি বীতশোক ভট্টাচার্য মনে করতেন 'উৎপল দত্ত মহাশ্বেতাদেবীর অতিবিপ্লবীয়ানা এক বিলাস ছাড়া কিছু নয়'।[২৮]

'বিচার' কবিতাতে তিনি তাঁর প্রতিবাদী মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন অতি বিপ্লবীয়ানাকে এড়িয়ে। দিল্লিতে ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে অন্ধদের এক প্রতিবাদী মিছিলের ওপর লাঠিচার্জের প্রতিক্রিয়া থেকে নাকি লিখেছিলেন এ কবিতা ঃ

"শ্মশানের শান্তি নামা মাঠ
থমথমে পাথরের চাঁই
উচাটন মন্ত্র করি পাঠ।
ঈশ্বরের চেয়ে ঘোর ভারি
পাথর, তুলতে তোকে চাই।

ভাই বন্ধু হাট থেকে ফিরি।
আড়বাঁশি মুছে ফেলে রেশ।

লাঠি ভেঙে কে রাত ভিখারী
বলে ঃ অন্ধ, এই সেই স্থান।
শেষ আর নিকেশ করা চাই।
বিচারক তাই এ পাষাণ।

আকাট রাখাল এর উপর
ব'সে দিত সাবলীল রায়;
কুড়ানিরে, এই নে পাথর
ভাঙ কোষ – ফুটিয়ে পালায়।
ধান কেটে নিয়ে যায় যদি
গলা কাট্ দে হেঁসোতে শান।

বত্রিশ সিংহাসন ঠিক
তোরই নীচে সংহত পাথর।
খরা মাঠে, ফাটে আট দিক।
অল্প শোকে কাতর যে কেউ।
তোর শোক, পাথর, অধিক;
তোর রাগ, পাষাণ, দে ঢেউ।

শিলাস্তরে অন্ধ ঢেউ দিই।[২৯]

('বিচার', 'অগ্রন্থিত কবিতা')

এই কবিতায় প্রতিবাদের সুর থাকলেও পাশাপাশি ইতিহাস আর লোকায়ত জীবনকেও খুঁজেপাওয়া যায়। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সম্বন্ধে ইতিহাস। রাজা বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রের কাছ থেকে একসময় উপহার পেয়েছিলেন সিংহাসন। ওই সিংহাসন ছিল যথার্থ বিচারের আসন। আদর্শ বিচারক এই সিংহাসনে বসে বিচার করতেন। হঠাৎ বিক্রমাদিত্য শালিবাহানের কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তারপর ঐ সিংহাসন চাপাপড়ে যায় মাটির গর্ভে। সিংহাসনের উপর

জমা হয় পাথর মাটি। পাথর মাটির স্তুপ পড়া সিংহাসনের ওপর দাঁড়িয়ে আকাট রাখাল রায় দিত সাবলীলভাবে, রাজা ভোজ এ খবর জানতে পারেন। পরে ঐ সিংহাসন উদ্ধার করে তিনি সিংহাসনে বসতে উদ্যত হলে সিংহাসনের গায়ে খোদাই করা বত্রিশটি পুতুল জীবন্ত হয়ে ওঠে। এক একটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে তাঁকে এক একটি গল্প বলে, তারপর উড়ে যায়। গল্পগুলির বিষয় ছিল বিক্রমাদিত্য মানুষ হিসেবে কেমন ছিলেন। রাজা হিসেবে কেমন বিচারক ও শাসক ছিলেন এবং প্রজাদের উপর কেমন কর্তব্য পালন করতেন। এই বত্রিশটি পুতুলের গল্পের নাম ছিল 'বিক্রমার্কচরিত'। অন্য নাম সিংহাসন দ্বাত্রিংশিকা বা বত্রিশ পুতুলের গল্প।

এই ঐতিহাসিক গল্প প্রধানভাবে উঠে এসেছে লোকমুখ থেকে। যা আজও প্রত্যেকের ঘরে মুখে মুখে প্রচারিত। কবিতায় প্রত্যেকটি শব্দকে তিনি মন্ত্রের মত কাজে লাগিয়েছেন। সিংহাসন, সিংহাসনের গায়ে পাথর খোদাইয়ের প্রসঙ্গ ও প্রকরণ সেখানে কবিতার মূল বিষয় তার উপর সাতের দশকের তুমুল বিপ্লব আট দিকের খরাতে ফাটা মাঠ স্তুপ আকারে জমেছে। মন্ত্র উচ্চারণ করেও, মন্ত্রে আটঘাট বেঁধেও এই দশকের রক্তাক্ত প্রেক্ষাপটের হাত থেকে নিস্তার নেই। কবিতায় আছে মন্ত্র, ধান, ধান হরণের দস্যুতা, গলা কাটার হেঁসো, ভাইয়ের গলা কাটার জন্য ভাই, বন্ধুর ঘাড়ে কোপ মারার জন্য বন্ধু। আছে শ্রেণি সংগ্রাম, শোক, বিচার। এ সবকে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য স্বাধীনভাবে উচ্চকন্ঠে নয়, নিম্নকন্ঠে প্রতিবাদ জানিয়ে বাস্তব জীবনে নতুনভাবে উপস্থিত করেছেন শিল্পি সমগ্রতায়।

জনসাধারণ আজও বিশ্বাস করে বিচারককে, বিচারকের আসনকে, বিচারকের বিচার ক্ষমতাকে। আজ বিচারকের যথার্থ বিচার নেই, তাই নীরিহ মানব পীড়িত হয়, অত্যাচার চলে তার ওপর, অন্ধ মানুষেরাও শাসকের রোষ থেকে বাঁচতে পারে না। মানুষ অন্ধকার বিধান প্রাপ্ত। রাজা বিক্রমাদিত্যের ন্যায্য বিধানের মতো, আকাট মূর্খ রাখালের সাবলীল বিধানের মতো আজকের মানুষ বিধান দেন না। এখনের বিধান হল কেউ ধান কেটে নিয়ে গেলে পরিবর্তে শান দেওয়া হেঁসো দিয়ে তার গলা কেটে যেতে হবে। এ কবিতাকে কবি ইতিহাস থেকে পুরাণে, লোকায়ত জীবনে নিয়ে এসেছেন। পাষাণে ঢেউ তোলার যে চিত্র এখানে ফুটে উঠেছে তারও পিছনে আছে মিথ, সম্প্রতিক ইতিহাস এবং লোকায়ত জীবন। কবি বাস্তব জীবনে পুরাণ এবং লোকায়ত জীবনকে উপস্থাপিত করেছেন নতুনভাবে। এখানে সামাজিকতার শর্ত ও শিল্পীর স্বাধীনতা সমানভাবে স্বীকৃত। কোনো বিচ্ছিন্নতা নয়, দ্বীপান্তর নয়, শিল্পী স্বাধীনতায় বিশ্বাস রেখে

কবি পুরাণ, ইতিহাস, রাজনীতির ভেতর থেকে ভারতবর্ষকে নতুনভাবে আবিষ্কার করতে সাহায্য করেন পাঠককে।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য মেদিনীপুরের ভাবুক কবি। ভূমি অর্থাৎ মাটির সাথে ভাষা প্রতিমার অন্তরঙ্গতা স্পষ্ট দেখিয়েছেন সত্তর দশক থেকে লেখা শুরুর নির্মাণপর্ব থেকেই। তিনি এক হাতে ধরেছেন কবিতা ও অন্য হাতে ধরেছেন মানুষের হাত। পরম্পরার আলোকে পথ হেঁটে নতুন পথের সন্ধানে আবিষ্ট থেকেছেন। শ্লোগানধারী কবি নন তিনি। সমসময়ের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক পরিবেশ সংকটকে কবিতার বিষয়বস্তু করেননি। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সৎজীবন যাপনের অনুভূতি। গত শতাব্দীর সত্তরের উত্তাল সময়কে কবিতার উজ্জ্বল রং-এ এঁকেছেন তাঁর 'অনেক স্বর্ণাভ পাখি' কবিতায়:

"অনেক স্বর্ণাভ পাখি আমাদের গৃহদ্বারে সন্ধ্যায় এসেছে ;
তাদের সুতীক্ষ্ণ চঞ্চু অতর্কিত আক্রমণ পিত্তলে বাঁধানো
দানব শৃঙ্খল খুলে দিলে যারা মূঢ় জন্তু স্বপ্নের উপরে
উঠে আসে, ছিঁড়ে খায়; তেমনও মাংসাশী নয়, সুবর্ণের তেজে

তাদের সমস্ত পাখা পুড়ে যায়, এই জ্যোতির্ময় ডানা সহজে
লুকোনো সম্ভব নয়... মনে পড়ে শিকারের বাজপাখি ঘরে
একদা এনেছি রেখে, অন্ধকারে ভালো থাকে তাদের বানানো
অন্যূন হিংস্রতাগুলি; অথচ স্বর্ণাভ পাখি, তোমরা এলে যে,

নাগরিকতার শান্তি, তোমরা কিছু কী তার কতটুকু জানো ? [৩০]
('অনেক স্বর্ণাভ পাখি' , 'অন্য যুগের সখা')

কবি এখানে স্বার্ণাভ পাখিকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। আর তেমনি প্রতীক হিসাবে এসেছে শিকারের বাজপাখি এবং প্রতীককে আমরা ধরতে পারলাম নাগরিকতার শান্তি শব্দটির ভেতর দিয়ে। কবি বিপ্লবকে দিয়েছেন হিরন্ময় রূপ। তিনি বিশ্বাস করেন বিপ্লবী যুবকদলই আনতে পারে পরিবর্তনের সূর্যোদয়। দেশ, রাজ্য ,পরিবার তখন সন্ত্রাসের অন্ধকারে আচ্ছন্ন। স্বর্ণাভ পাখিদের জ্যোতির্ময় ডানার তেজই পারবে শিথিল সময়কে সচল করতে। তাই কবি ওই

সময়ের রক্তাক্ত বিপ্লবের মুহূর্তে আহ্বান জানিয়েছেন স্বর্ণাভ পাখিদের।

কবি বাস্তবচেতনাকে বা প্রকৃতিচেতনাকে করে তুলেছেন ইতিহাসচেতন এবং দ্বন্দ্ব জটিল। এ প্রসঙ্গে 'নতুন কবিতা'র 'পান্ডুলিপি' কবিতার থেকে ছত্র দুটি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

"তুমি ধরে আছ কানে দুল তালপাতা
তার মানে সেটা ভূর্জপত্র নয়।" (৩১)

('পান্ডুলিপি' , 'নতুন কবিতা')

এখানে কানের দুল হিসাবে কবি তালাপাতার কথা বলেছেন। তালপাতা প্রকৃতিজাত। আবার এই তালপাতাই হয়ে উঠেছে অলঙ্কার যা মানুষের প্রয়োজনে লাগবে। এও একধরনের শিল্প। ভূর্জপত্রে আছে প্রাচীন ও মধ্যযুগের রচনা। তালপাতার এই শিল্প আর ভূর্জপত্রে রচিত প্রাচীন ও মধ্যযুগের শিল্পের কোনো পার্থক্য নেই। সে শিল্পে নান্দনিকতাও আছে আবার বাস্তব প্রয়োজনও আছে। এখানে শিল্প দুটি দুরকেমর হলেও এক বস্তু থেকে উঠে এসেছে। দ্বন্দ্ব জটিলতা নেই। প্রকৃতির সারল্য থেকে ও প্রকৃতির দান থেকে নির্মিত হয়েছে তালপাতার অলঙ্কার। এ অলঙ্কার একদিকে মানুষের প্রয়োজন মিটিয়েছে অন্য দিকে স্পর্শ করে আছে শিল্পের আনন্দকে।

কবির কবিতা সমময়ের অনেক উর্ধ্বে। সময়ের সঙ্গে লড়াই করার জন্য কবিতাই তাঁর একমাত্র অস্ত্র। সমসাময়িকদের থেকে আলাদা হয়ে রচনা করেছেন ভিন্ন কবিতা। নিজের পরিচয় দিতে তিনি লিখেছিলেন :

"মান মন্দিরের ঊর্ধ্বে ঐ জেগে থাকা আমার হৃদয়;
সে একা একটি তারা" (৩২)

('কেমন হৃৎপিণ্ড তার' ,'অন্য যুগের সখা')

তিনি মানমন্দিরের ঊর্ধ্বে জেগে থাকা একক তারা। তারা জ্বলে উঠেছে কীভাবে সেটা সময়কে আরও কয়েক রাত জেগে খুঁজে নিতে হবে। তাঁর কবিতায় সমকালের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ঘটনা দুর্ঘটনাগুলো না থাকলেও তিনি কবিতাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর আধুনিক মনের নান্দনিক অনুভবের সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেয়েছেন ভারতবর্ষ ও বাংলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে। ওই সময়ের সমসাময়িক ভাষা, সামাজিক সংশ্লেষ, বাক্ সার্বস্বতা

থেকেও সরে এসেছেন তিনি। কিন্তু মহাকাল বা চিরন্তন কালের কথা বলেছেন কবিতাতে। শিল্পিত সমগ্রতায় তাঁর কবিতায় ঐতিহ্য শব্দটির যোগ আছে। সমকাল থেকে তিনি পিছিয়ে যান বেদ উপনিষদও পুরাণের কাছে, যান জেন-এর বিশ্বাসের জগৎ-এ। এখান থেকে তাঁর অবাধ যাত্রা লোকশিল্প, লোককথার লৌকিক জগতে। তাই তাঁর কবিতা এই দশকে লেখা হয়েও ওই সময়ের অন্য কবির থেকে আলাদা।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কবিতা চায় সংশ্লেষণ। তাঁর কবিতা যে একটা সংশ্লেষণ চায় তা তিনি নিজেও স্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে বলেন :

> "সত্তরের কবিতার দুটো স্বতন্ত্র ধারা তৈরি হয়েছে, তার একটি ধারা যাঁরা রচনা করেছেন তাঁরা ঘোষিত ভাবে রাজনৈতিক, উচ্চারিত ভাবে দায়বদ্ধ সংস্কৃতিকর্মী। '(দায়বদ্ধ শব্দটা আমার কাছে যেন বাংলা শব্দ বলে মনে হয় না) তাঁরা অন্য ধারাটিকে স্বীকার করেন না, অন্য ধারাও একে সমানভাবে অস্বীকার করে। এই পারস্পরিক অস্বীকৃতি এই দ্বিধা – এখান থেকে সত্তরের দশক কোনো সংশ্লেষে উত্তীর্ণ হতে পারলে ভালো হতো।' (৩৩)

যে সংশ্লেষে কবি উত্তীর্ণ হতে চান তা হল সেই সময়কার একমুখী, সরল কবিতা রচনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। কবিতা মানুষের জীবনের সমগ্র অস্তিত্বকে ছুঁতে চায়, স্বপ্ন স্মৃতি আনন্দ বিষাদের অনুভূতিকে ধরতে চায়। এই অনুভূতি গুলির টানাপোড়েনে জর্জরিত মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছিলেন বীতশোক ভট্টাচার্যের মত কবি যিনি এই পৃথিবীর মানুষকে, মানুষের জীবনকে দেখেছিলেন স্বাভাবিক জীবন থেকে। কবি মনে করেছিলেন শিল্পই আনন্দ অনুভবের প্রকাশ মাধ্যম যা উঠে আসে বাস্তব জীবন থেকে, স্বাভাবিক জীবন যাপন থেকে। বলা যায় কবির কবিতার জগতে সমসাময়িক সমাজজীবন থেকে বেশি করে উঠে এসেছে ইতিহাস, দর্শন, শিল্প ও সাহিত্য তত্ত্ব পাঠ। তিনি একমুখী প্রবণতা থেকে মুক্তি নেন, সরে আসেন মানবপ্রকৃতি আর নিসর্গের কাছে। তাঁর কবিতায় 'লোকায়ত জীবন ও চিরায়ত ইতিহাস' স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি যাত্রা করেছেন পুরাণের দিক থেকে সাম্প্রতিকের দিকে। পুরাণ আর ইতিহাসকে এক করে দিয়েছেন। লোকায়ত জীবন এবং দৈনন্দিন জীবনকে সমানভাবে দেখেছেন। এ প্রসঙ্গে 'বিধান' কবিতাটি উল্লেখ করা যায় :

> "সেদিন বিকেলে মরে এসেছিল আলো

হেঁটে হেঁটে আমি গিয়েছি পাড়ার শেষে
দেখেছি দাওয়ায় দাঁড়ানো মাটির মেয়ে
মুখ নেই তার চোখ মুখ কিছু নেই
ঝরে গেছে সব ধুয়ে মুছে ক্ষয়ে গেছে
আঁচল ধরেছে খর্বুটে এক শিশু
হাত নেই তার কুঠ দুটো হাতই নেই
বুক চাপা পড়া ভয়ে দম আটকাল
থমকে দাঁড়াই, হাঁপ ছাড়ি কাছে এসে
চোখ নেই তবু মেয়েটি রয়েছে চেয়ে
হাত নেই তবু আঁচলটি হাতে সেই
এখন এমন ঘুমে পাওয়া গ্রামদেশে
মেয়েটি হয়েছে প্রতিমার মতো ঋজু
ছেলেটা মূর্ত হয়ে ক্রমে উঠছেই

ছায়ার মূর্তি আশেপাশে মাটি কালো
ঘনিয়ে এসেছে দরজায় ওরা কে যে
দেওয়ালের কাছে কাদের দেখতে পেয়ে
ঠোঁট নেই তবু মেয়েটি বলল, এই
তুমি পুরোহিত পুথি খুলে দাও এসে
আমাকে চিতায় তুলে দাও, শুনে শিশু
আমার দিকেই হাত তুলে ছুটে এল।" (৩৪)

‘ (বিধান’ , ‘এসেছি জলের কাছে’)

কবিতাটি কুষ্ঠ নিয়ে লেখা। এ কবিতার মধ্যে দেখতে পাই ক্ষয়ে যাওয়া বিশ্বের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুরবস্থার চিত্র। এখানে উপস্থিত দারিদ্র্য পীড়িত মানুষ, কুষ্ঠরোগাক্রান্ত জীবন, শেষপর্যন্ত মৃত্যুমুখী হওয়া, বোবার মতো থেকে এক একটি পরিবারের এই নিয়ম মান্য করা বা অমান্য করা। কুষ্ঠ রোগ আমাদের দেশে প্রাচীনকাল থেকেই আছে।

মধ্যযুগে কুষ্ঠরোগ নিয়ে ধর্মমঙ্গল কাব্য 'রচিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে কুষ্ঠরোগ। তাই এই রোগাক্রান্তদের সরিয়ে দেওয়া হয় অন্য জায়গায়। তাদের প্রতি চলে মানুষের অমানবিক আচরণ। এর বিরুদ্ধে প্রচার করেও রক্ষণশীল, গোঁড়া মানুষকে বোঝানো যায় না।

আমরা দেখতে পাই এ কবিতায় দৃশ্যমান জগৎ কেমন চলে যাচ্ছে অদৃশ্য জগতের দিকে। চোখ নেই তবু চেয়ে আছে, হাত নেই তবু আঁচল ধরে আছে। ঠোঁট নেই তবু কথা বলছে সবগুলোকেই স্বপ্ন বলে মনে হতে পারে। বাস্তব থেকে স্বপ্নে ও স্বপ্ন থেকে বাস্তবে কবিতার চলে অবাধ যাতায়াত। এ যেন ম্যাজিক বা জাদুর সাহায্য নিয়ে ঘটেছে। শিল্প আর জাদু এখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

এখানে বাস্তব এবং বাস্তবতর জীবনের উভয় দিক আছে। 'দাওয়ায় দাঁড়ানো মাটির মেয়ে' হয়ে উঠেছে মৃন্ময়ী প্রতিমা। মানুষ মাটি দিয়ে তৈরী হয় না। মাটির মতো সহজ, সরল, সহিষ্ণু এবং লৌকিক মন নিয়ে তৈরী হয়। এখানে মাটির মেয়েটি ওই মন নিয়ে 'প্রতিমার মতো ঋজু' হয়ে উঠেছে। কবি নারীও প্রতিমাকে এক করে দিয়েছেন। লোকায়ত জীবনেও নারী ও প্রতিমাকে এক করে দেখা হয়। এ যেন মূর্ত জীবন থেকে বিমূর্ত জীবনের আনন্দে উজিয়ে যাওয়া। একইভাবে ছেলেটিও মূর্ত থেকে হয়ে উঠেছে মূর্তি। এ এক অদ্ভুত আর্কিটাইপ।

'বিধান' শব্দের অর্থ হল বিধি বা নিয়ম। এ কবিতার যাত্রা অনির্দেশ্যতার নির্দিষ্ট বিধানের দিকে আবার নির্দিষ্ট বিধান থেকে অনির্দেশ্যতার দিকে। তাই কবিতাটি বিধি বা নিয়ম কখনো কখনো মান্য করছে, আবার করছেও না। ব্যক্তি না হলেও মেয়ে শিশু, পুরোহিত এখানে নির্দিষ্ট আবার

'দরজায় ওরা কে যে
দেওয়ালের কাছে কাদের দেখতে পেয়ে'–

ছত্র দুটিতে 'কে যে',' কাদের' শব্দিগুলির মধ্যে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা নেই, সুতরাং অনির্দেশ্য। ঠোঁট নেই তবু কথা বলা, হাত নেই তবু আঁচল ধরা। হাত তুলে ছুটে আসা সবগুলোই যেন নিয়ম মানছে আবার মানছে না। নিয়ম মানা এবং না মানাকে কবি একাকার করে দিয়েছেন।

আকার থেকে নিরাকারে আবার নিরাকার থেকে আকারের দিকে চলে যাচ্ছে এ কবিতা, যাচ্ছে জীবন থেকে মৃত্যু, মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে। কুষ্ঠরোগে ক্ষয়ে যায় মানুষ। জলে ধোওয়া হয়ে ক্ষয়ে যায় মাটির প্রতিমা। দুটিই ক্ষয়, একটি অসুখে, অন্যটি প্রকৃতির নিয়মে ক্ষয়ে

যাওয়া অর্থাৎ আকার থেকে নিরাকারে যাওয়া, জীবন থেকে মৃত্যুর দিকে যাওয়া বোঝাচ্ছে :

"ঠোঁট নেই তবু মেয়েটি বলল, এই
তুমি পুরোহিত পুথি খুলে দাও এসে
আমাকে চিতায় তুলে দাও . . . ।"

আবার নিরাকার থেকে আকারে ,মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে ফিরে আসছে কবিতা –

'ঘুমে পাওয়া' গ্রাম দেশের থেকে মেয়েটি ঠোঁট নেই অথচ বলে ওঠে পুরোহিতকে পুথি খুলে দিতে, তাকে চিতায় তুলে দিতে।

'সেদিন বিকেলে মরে এসেছিল আলো'–

কবিতার শুরুতেই আছে আলোর মরে আসার প্রসঙ্গ। আলো মরে যাওয়া অর্থাৎ অন্ধকার হওয়া। এখানে মরে, ক্ষয়ে, ঘুমে, ছায়া ইত্যাদি শব্দগুলো মৃত্যুকেই ইঙ্গিত করে। ইঙ্গিত করে দরিদ্র অসহায় মানুষের জীবনকে। যাদের জীবন বিকেলের মরে যাওয়া আলোর মতো, যাদের জীবন খর্বুটে, সহজেই ক্ষয়ে যায়,ঝরে যায়। এর পাশাপাশি কতগুলো শব্দের কথা কবি বলেছেন, যেগুলি মৃত্যু নয় প্রতিমুহূর্তের জীবনকে, জীবনযুদ্ধকে ইঙ্গিত করে, যেমন- হেঁটে হেঁটে, আলো, আঁচল ধরেছে, মূর্ত, ঋজু ইত্যাদি শব্দ। আলো-অন্ধকারের টানা-পোড়েনে কবিতার শেষে দেখি পুঁথি খুলে দেওয়া, চিতায় তুলে দেওয়ার কথা শুনে শিশুটিও প্রতিবাদ করেছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে। অসহায়ভাবে এ মৃত্যুকে শিশুটি মেনে নিতে চায় না :

" . . . . . শুনে শিশু
আমার দিকেই হাত তুলে ছুটে এল।"

কবিতাটিতে স্বপ্ন, বাস্তব, অবাস্তব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এখানে একই সঙ্গে ঘটেছে সমস্ত ঘটনা। নিয়ম মেনে বাস্তব যুক্তি মেনে সময় ধরে কবিতাটি এগিয়ে গেছে – বিকেল থেকে রাত্রি, হেঁটে হেঁটে পাড়ার শেষ পর্যন্ত যাওয়া, ঘরের দাওয়ায় চোখ যাওয়া, আগে রূপ দেখে তারপর ভয় পাওয়া, পরে কথা শোনা ইত্যাদি। পাশাপাশি অবাস্তবতাও আছে হাত না থাকলেও আঁচল ধরার মধ্যে, ঠোঁট না থাকলেও কথা বলার মধ্যে, হাত তুলে ছুটে আসার মধ্যে। এ কবিতায় জীবন সামাজিক আবার অসামাজিক, জীবন নিয়মবদ্ধ আবার অনিয়মশীল, জীবন আকার ও নিরাকারও। এখানে জীবন সম্পূর্ণভাবে উঠে এসেছে লোকজীবন থেকে। এই কবিতাতে প্রতিবাদও আছে। পুরোহিত পুথি খুলে যে বিধান বা নির্দেশ দেয় শিশুটি হাত

তুলে তার প্রতিবাদ করে। আঘাত করে পুরোহিততন্ত্রকে। শোষিত, লাঞ্ছিত হয়েও শিশুটি শোষক শ্রেণীকে দাঁড় করিয়ে দেয় অভিযোগের কাঠগড়ায়।

'বিধান' কবিতাটি সংশ্লেষণের কবিতা এখানে দর্শক আর পাঠকের সংশ্লেষণ ঘটে। একটার পর একটা ঘটনা কবিতার মধ্যে ঘটে কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ কবিতা বিশেষ স্থানের নয়, বিশেষ কালেরও নয়, অর্থের পদ্ধতিকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে নতুন বিধান সৃষ্টি করে এ কবিতা। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত মানুষগুলি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন। তবে তারাও সুস্থ মানুষের মতো সামাজিক আচারণ করে। কিন্তু তাদের আচরণে যুক্তি পরম্পরা থাকে না। তাই কবিতাটিকে মনে হতে পারে অনর্থক।

সত্তরের জটিল রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মুহূর্ত, যে সময়ে প্রত্যেক মানুষের স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাচ্ছে ওই সময়ে কবি নতুনভাবে ছবি আঁকছেন আতঙ্কগ্রস্ত মানুষের। প্রকৃতি বা বাস্তব তখন তাঁর কবিতায় শিল্পরূপে ধরা দিয়েছে, একদিকে শিল্প অন্যদিকে মানুষের আনন্দ, হাহাকার, মিথ-ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে কবি নিজেকে প্রকাশ করেছেন প্রকৃতি এবং শিল্পের মিল আর বৈপরীত্যের মধ্য দিয়ে। অতিপ্রাকৃত গভীর অন্ধকার থেকে সমস্ত জন্তু হিংস্র হয়ে নখ দাঁত থাবা বাড়িয়ে কোনঠাসা করে মানুষকে :

"পাখি কি আমাকে সঙ্গে নেবে
সে গান নিবিয়ে দিয়ে নখ রাখে আমার দু'কাঁধে [৩৫]

('জাতক' , 'শিল্প')

ঠোঁট মুখ চোখ খুবলে খেতে চায় তীক্ষ্ণচঞ্চু পাখি :

"সমুদ্র পাখির নখ ছিঁড়ে খায় আজ তার চক্ষুর পালক"[৩৬]

('বিভঙ্গ',' শিল্প')

কবির কবিতায় পংক্তি রক্তাক্ত হয়ে ওঠে এইভাবে, ঝলসে ওঠে শব্দ ও চিত্রকল্পের ব্যবহার। একটানা বাক্যের ব্যবহারে যেন কবিতার মধ্যে জমে ওঠে অন্ধকার আর শূন্যতা।

সবচেয়ে গভীরভাবে রিলকের পাঠ নিয়েছিলেন বাঙালী কবিদের মধ্যে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য। তিনি নিজস্ব মননে ও শৈলীতে ধারণ করেছিলেন রিলকের ভাবনা। কবিতাকে আলাদা মাত্রা দিতে চেয়েছিলেন। বহু দ্বন্দ্ব, বহু ইতিহাস ছিল সে প্রক্রিয়ায়। ১৯৭২-৭৪ সাল, রচনা করেছেন 'অন্য যুগের সখা'র কবিতা। সেই সময় রক্তের ভেতরে যে শান্তি তিনি বহন

করেছিলেন, যে হিংস্রতা তাঁর কবি মানসকে রক্তলাঞ্ছিত করেছিল তা থেকে পরিত্রাণ পেতে তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন 'বস্তু'র। প্রায় ঈশ্বরকল্প করে গড়ে তুলেছিলেন বস্তুকে :

"একাকী তোমার ভয়ে স্তব্ধ হয়ে আছে আজ নিখিল পৃথিবী;
এসো, তুমি কথা বলো, বলো, তুমি ভালো আছ, বলো, এই থাকা
জগৎ আশ্বস্ত করে, ক্ষমা করুণার মতো শীর্ণ আঁকাবাঁকা
দাও মূল অক্ষরের কিছুটা সাহস, যাতে ওই স্তব্ধ দিবি
প্রতিষ্ঠার প্রলোভন স্থায়ী হয় দূরে গিয়ে, নক্ষত্র-ভুবনে
তোমার কী গৃহ আছে ? মৃত্যু কী তোমার হবে ? না হলে তুমিও
আমার সঙ্গে এসো, একটি একাকী বস্তু, আমাদের গৃহ
প্রায় ভাঙাগড়াময়, আর কে সান্ত্বনা দেবে মৃদু ভূকম্পনে।[৩৭]

('একাকী তোমার ভয়ে' , 'অন্য যুগের সখা')

বস্তুই পারে মানুষকে সান্ত্বনা দিতে। লোভ ও আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে ওই সময়ে বিশ্বের ভাঙাগড়ার খেলায় মেতে উঠেছিল মানুষ। কবি মনে করেছিলেন এই ভয়ঙ্কর মুহূর্তকে থমকে দিতে পারে কাল্পনিক ঈশ্বর রূপ বস্তু যার 'ভালো আছি' এই খবর পৃথিবীকে করবে নিরুদ্বেগ। ক্ষয়হীনতার কিছুটা সাহস মানুষ চাইতে পারবে বস্তুর কাছে, যে সাহস থাকলে স্বর্গে প্রতিষ্ঠার লোভ থেকে দূরে সরে আসবে মানুষ। কেননা লোভের জন্যই তো বিশ্ব আজ ধ্বংসের পথে। তাই কিছুটা ভয়ে, কিছুটা আকুলতায় কবি আহ্বান করেছিলেন বস্তুকে এবং তাকে শিল্পে রূপ দিয়েছিলেন।

কবির কবিতা নানাভাবে নানামাত্রা নিয়ে উপস্থিত। কখনো তিনি দূরে সরে যেতে চেয়েছেন কখনো কাছে ঘনিয়ে এসেছেন। 'কেমন হৃৎপিন্ড তার' কবিতাতে তিনি এই দূরপ্রস্থানের অনুভূতির ছাপ রেখেছেন :

'বন্ধুদের থেকে কত বাধ্যতামূলক দূর।'

আবার একই সময়ে 'রাখালিয়া' কবিতাতে ঘনিয়ে আসতে চেয়েছেন :

" ..... তোমারই গায় জড়িয়ে
দেবো ভোর রাতের আবছা চাদর তেমনই আদরে কী দিয়ে
ঢাকবে বলোতো ..... ভালোবাসা, সেই লাবণ্য

যা তোমার দেবো তোমাকেই, ... । ।" (৩৮)

('রাখালিয়া' , 'অন্যযুগের সখা')

কবি মানুষের অস্তিত্বের গোপন জায়গাতে চলে আসতে পারেন দূর প্রস্থানের এই প্রক্রিয়া দ্বারা। এর পর শুদ্ধ প্রেক্ষিতের দিকে কবির পক্ষে সম্ভব হবে ফিরে যেতে, শূন্যতার কথা বলবেন তিনি, আর এই মুহূর্তেই ধ্বনিত হয়ে উঠবে শূন্য :

"নিকটে, নিকটে এসো : প্লুতস্বরে চলে যায় ভেসে
আহ্বান, তোমার কাছে প্রথম ঘটনা;
তা তোমাকে বায়ু করে, প্রবাহিত, তার কন্ঠস্বরের উদ্দেশে
নির্দিষ্ট বওয়ায়, যাতে তোমার মত না

অন্য কেউ কথা বলে, অভিঘাতে শূন্য বেজে ওঠে;
তাকে বলে ভিন্ন স্বর, কারও প্রতিধ্বনি ;
যে নয় তুমি বা সে, নয় হাওয়া নিষ্কাষিত ঠোঁটে
দৃঢ় ঠোঁট এঁটে বসা তার প্রণয়িনী
যাকে সে এমনই ডাকে যেন প্রায় ; ডাকের প্রত্যয়ে
অবিরল, শ্রান্ত ডাকা, সন্ত্রস্ত সাদর ;
বুঝি বা জেনেছে এই তার এক সৃষ্ট চাপ, প্রেরণার ভয়ে
তা খোলে জন্মের উৎস, ওষ্ঠ ও অধর।" (৩৯)

('প্লুতস্বর' , 'অন্যযুগের সখা')

কবিতাটি ভালোবাসার ভালোবাসা নিয়ে লেখা। ভালোবাসা মানুষকে ডাকে নিজের উদ্দেশ্যে। এই কবিতাকে আমরা বলতে পারতাম একটি আদর্শ প্রেমের কবিতা। কিন্তু কবি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দিয়ে সে প্রেমের ডাকে শোনালেন শূন্যতার ধ্বনি। দৃঢ় ঠোঁট এঁটে বসা, শান্ত, সন্ত্রস্ত, সাদর, প্রত্যয়-শব্দগুলি মূর্ত প্রেমের অভিব্যক্তিকে ফুটিয়ে তুলেছে। ভালোবাসার প্রকাশ অবলম্বিত আছে 'জন্মের উৎস ওষ্ঠ ও অধর' বাক্যাংশে। বিমূর্ত প্রেমের দূর প্রান্তে গিয়ে মূর্ত প্রেমের অভিব্যক্তিগুলোকে যেন শূন্য হয়েই বেজে উঠতে শোনা গেল।

'হাজার বছরের বাংলা কবিতা' সংকলন করতে গিয়ে কবি বুঝেছিলেন ঔপনিবেশিক

দাসত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হবে। প্রত্যাখ্যান করতে হবে ক্ষয়ে যাওয়া রোমান্টিক আবেশের প্রসঙ্গ ও প্রকরণকে। বাঙালীর ভারতীয় ঐতিহ্যের মাটিতে শিকড় চারিয়ে দিয়ে লোক ঐতিহ্যের সন্ধান করতে হবে, স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়াতে হবে বাংলা রৌদ্র ও মাটিতে, বাংলার শ্যামল মুখ, সংস্কৃতির শিকড় খুঁজে নিতে হবে। তাঁর এই শান্ত প্রতিবাদী চেষ্টা দেখা গেল সেই সময়ে। ভারতীয় সংস্কৃতিকে তিনি বিনির্মাণ করতে চাইলেন ভারতীয়দের দর্শন দিয়ে। ভারতীয় ঐতিহ্যের সন্ধান করলেন কাব্য, গান, চিত্র, নৃত্য, ভাস্কর্য ও নাট্য এসব শিল্পিত প্রকাশের মধ্য দিয়ে।

লোকঐতিহ্যের সন্ধান করতে গিয়ে দেখা যায় কবির কবিতার মূল উপাদান হল গান। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা কাব্য একদিকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আবার গানও। আরো এগিয়ে আখড়াই, হাফ আখড়াই, নিধুবাবুর টপ্পা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত দেখলে দেখতে পাব কবিতা আর গান মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। আরো পরের রচনাগুলিতেও একই চিত্র দেখা যায়। এই উত্তরাধিকার মেনে নিয়েই কবি বীতশোক ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় গান নিয়ে আসেন নতুন ভাবে :

"আধখানা গান সঙ্গীতকে দেয় দুয়ো ;
আধখানি গান নেমে চলে হাঁটা পথে।" [৪০]

('এই গান' , ' নতুন কবিতা')

তাঁর কবিতায় গান-পথ- নদী পরস্পর মিলত হয়ে নতুন এক বোধের জন্ম দেয়।

তিনি পুরানো কবিদের কাব্যে চলে যান গানের হাত ধরে। প্রাচীন কাব্য পুনরায় লিখেন সমসময়ের পটে :

"যেন মালিনীর সেই ছায়া ছলছলে
জলে নেমে গেছি – এমনি প্রেমের গান
এসো গাওয়া হোক নান্দী সদলবলে।
করুক পুলিশ মেরে ধরে কুটিকুটি।"

('শকুন্তলা' ,' নতুন কবিতা ')

এ কবিতায় আছে কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর হংসপদিকার নেপথ্য গানের ইঙ্গিত। 'মালিনী' উঠে এসেছে কালিদাসের নাটক থেকে।

আবার ইতিহাসের দিকেও তিনি চলে যান গানের উপর ভর করে :

"রোদ থেকে ফিরে এসে আমি শুনি বেগম আখতার,
আর স্নিগ্ধতায় ক্রমে ভরে ওঠে আমার দু-হাত।
বিস্তারের শুরু হয় গালিবের গজলের থেকে,
পিছু নেয় ক্রমাগত বিষণ্ণ কর্কশ স্বরাঘাত।
উঁচু বাড়ি প্রাচীরের দু-পাশেই ছায়াস্তব্ধতার;
যেন নির্জনতা এই, বিদ্রোহ পিছনে ফেলে রেখে।
কিছুই না চাওয়া শুধু চারিদিকে শান্তি মোড়াঘর
ক্রমশ ধূসর হয়ে স্থাপত্যের সজল হাওয়ায়।
কালচে সবুজ হাওয়া; কপালে শ্যাওলা এক গড়ানে পাথর
ভেঙেচুরে নিচে নামছে রুক্ষ রূঢ় ক্রমিক বেলায়
কপালে শ্যাওলা তবু ; পাষাণ ফাটিয়ে দিয়ে সবুজ পাতার
কেতন উড়ছে গানে, অথচ সে-মর্মরের সৌধ থেকে যায়।" [৪২]

('গান','নতুন কবিতা')

এ কবিতায় ব্যর্থ ইতিহাসের চিত্র দেখতে পাই। সিপাহী বিদ্রোহের সমসাময়িক ছিলেন গালিব। তিনি জেলে গিয়েছিলেন ওই সময়। বেগম আখতারের গানের স্বর যেন তখন হয়ে উঠেছে 'বিষণ্ণ কর্কশ স্বরাঘাত'। ফলে এ কবিতা ও হয়ে উঠেছে বিষণ্ণ বেদনাতুর। এখানে বিদ্রোহীদের ব্যর্থতা ফুটে উঠেছে 'উঁচু বাড়ির' প্রাচীরের দুপাশের'র স্তব্ধ ঘন ছায়ার মধ্যে।

কবির কবিতায় উঠে আসে ছৌ-নাচের কথা, পটের কথা। 'ছৌ' কবিতার প্রসঙ্গ কবির নিজস্ব ধরনে স্থাপিত।

"এসো খুঁজে নিই আমরা শূন্যতাকে;
এই বলে ঘরে সেই দিন ভোর রাতে
তুমি দুটো হাতে ধরেছ এ মুখটাকে।
আমিও দুহাতে ভরেছি তোমার মুখ।

কেন কাগজের মুখোশের মতো লাগে ;
ছুঁয়ে ছেনে দেখি তোমার চিবুক ভুরু।

আমাকে বলেছ ; মুখ ভারি কেন এত :
এখনি কি হবে গম্ভীরা নাচ শুরু।

অমনি শুনেছি ধামসার গুরু গুরু।
দাঁড়ানো গণেশ ছুটে এসে নামে মাঠে।
পুরুষ নারীরা শিশু নিয়ে কোলে কাঁখে।
রাম আর সীতা দুজনেই ছৌ নাচে
ভালো অভিনয় করেছে সে রাতে খুব।
হইচই হাসি শানাই কান্না ঢাকে
আমাদের গলা চাপা পড়ে গেল কত।
দুজন দেখেছি দুজনের পুরো মুখ। [৪৩]

('ছৌ' , 'এসেছি জলের কাছে')

ছৌনাচ হয় মুখোশ পরে। এ কবিতাতে মুখ থেকে এসেছে মুখোশের কথা। মুখোশের ভার থেকে আসছে ভারি শব্দ। তারপরেই গম্ভীরানাচ শুরু, 'ধামসার গুরু গুরু' রব ছৌ নাচের মধ্যেই দেখা যায়। ছৌ নাচের মুখোশ ফিরে আসে আবার মুখে।

এখানে আমরা পাচ্ছি প্রাণবন্ত একটা ছবি– ধামসার বাজনা শুনে দাঁড়ানো গণেশ ছুটে এসে মাঠে নামে নাচের জন্য , বৃত্তের আকারে ঘিরে ধরে পুরুষেরা, শিশু কোলে নিয়ে নারীরা। এ চিত্র যে আমাদের বাংলার চিত্রের কথা স্মরণ করায়। কবি এ কবিতাকে নিয়ে গেছেন ব্যক্তিক থেকে নৈর্ব্যক্তিকে।

কবির কাছে ঐতিহ্য কেবলমাত্র পুনরায় আবৃত্তি নয়, ওই সময়ের প্রয়োজনে কবিতাকে তিনি বিনির্মাণ করেছেন। তখনই কবিতা হয়ে উঠেছে প্রাণময় এবং গতিময়। তাঁর কবিতায় সমসময়ের পটে বিনির্মাণ ঘটেছে বুদ্ধবাদের। বৌদ্ধদর্শনের প্রতি বিশ্বাস রেখে সত্তরের দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো কবিতা 'জাতক' :

"মানুষ মরছে শীতে
পৃথিবীতে বেড়ে যাচ্ছে শীত
বৈশালীতে বুদ্ধ হাঁটছেন

নির্বাণ চাই না আর তাঁর

মানুষ মরছে পিপাসায়
বুদ্ধ হেঁটে গয়ায় যাচ্ছেন
বেড়ে উঠছে পৃথিবীর তাপ
দোষ তিনি দেন না তৃষ্ণাকে
রাত্রে ঘরে লাগছে আগুন
বালি লাগবে, কান্না তারস্বর
আরো আছে ভিতরে মানুষ
বুদ্ধ ফেলে যাচ্ছেন বুদ্ধকে।"[৪৪]

('জাতক' , 'নতুন কবিতা')

কবিতাটির মধ্যে আছে 'কারন্ডব্যূহ' গ্রন্থের একটি কাহিনী[৪৫]। মহাযানী বৌদ্ধদের গ্রন্থ এটি। কাহিনীতে আছে অবলোকিতেশ্বর সর্ব করুণাময়। তিনি বোধিসত্ত্ব নির্বাণ লাভ করেন। নির্বাণ লাভ করার পর সুমেরু পর্বত থেকে লাফ দিয়ে তিনি মহাশূন্যতায় মিলিয়ে যেতে চান। সেই সময় বহুদূর থেকে মানুষের কোলাহল শুনে তিনি বিষণ্ণ হন। এরপর গভীর ধ্যানে মগ্ন হন। জানতে পারেন লোকজনের আর্তচিৎকার তাঁর নির্বাণ লাভের পর মহাশূ্যতায় মিলিয়ে যাওয়ার জন্য। তারা তাঁকে হারিয়ে ফেলতে চায় না। মানুষের বিলাপ শুনে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন যে যতদিন পৃথিবীতে জীব আবদ্ধ থাকবে ততদিন তিনি নির্বাণ নেবেন না।

কবি বীতশোক ভট্টাচার্য মহাযানী বৌদ্ধদের করুণার ধারাকে এই কবিতায় কাজে লাগিয়েছেন। জাতকের কাহিনী ও তিনি নিয়েছেন : 'বুদ্ধ ফেলে যাচ্ছেন বুদ্ধকে'। শীত ও খরা প্রকৃতির দুটি রূপ। দুই রূপ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে মানুষকে বিপর্যয়ে ফেলে। বিপর্যস্ত মানুষের প্রতি অন্তরের আন্তরিকতা, সহমর্মীতা নিয়ে মানুষের মানবিক দাঁড়ানোর কবিতা এটি। এবং এই মানবিকতাই যে সত্য তা কবি উচ্চকন্ঠে নয় শান্তভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১। ভিক্তর মাৎসুলেনকো, 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ', প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৭ , পৃ. ১০

২। প্রথম কমিউনিস্ট বিরোধী মামলা শুরু হয় ১৯২৪ সালে–কানপুরে। কারাদন্ড হয় শ্রীপাদ ডাঙ্গে, মুজফ্‌ফর আহমদ ও শওকত ওসমানী সহ মার্কসবাদী দলের নেতাদের। ১৯২৯-এর মার্চ মাসে ঔপনিবেশিক প্রশাসন বামপন্থী নেতৃবৃন্দের উপর আঘাত হানে। ভারতবর্ষের ৩৩ জন বামপন্থী তার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ১৪ জন এবং ১৮ জন ট্রেড ইউনিয়ন লিডারকে গ্রেপ্তার করে। আবার তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে রাজদ্রোহে। দীর্ঘ চার বছর ধরে চলে এই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

কোকা, আন্তোনভা ও বোনগার্দ–লেভিন, গ্রিগোরি এবং কতোভস্কি, গ্রিগোরি, ভারতবর্ষের ইতিহাস, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৮৮, পৃ. ২৩

৩। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ' বঙ্কিম রচনাবলী' (২য় খণ্ড), সাহিত্যসংসদ, কলকাতা, ১৯৮৩ , পৃ. ৩৫৭

৪। সকলের ভাবনার পেছনে বর্তমান ছিল ভারতীয় লোকায়ত জীবন আর লোকায়ত দর্শন। সাধারণ মানুষের জীবন, তাদের আচার আচরণ, প্রথা, বিশ্বাস, ভারতবর্ষের সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি সাহিত্যেও উপেক্ষিত ছিল না। আবার অসংস্কৃত প্রাকৃত প্রসঙ্গও সমানভাবে গৃহীত ছিল। এই লোকায়ত যুক্তিবাদী ভাবনা গুলি যুগে যুগে এদেশের শুদ্ধ ভাবব্যাকুলতাকে আক্রমণ করে ফেলেছে।

নিতাই জানা, 'পোষ্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়', প্রকাশনী – বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০১ , পৃ. ১২

'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'র প্রাসঙ্গিক অংশে কবি বীতশোক ভট্টাচার্য লোকায়ত যুক্তিবাদী ভাবনা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন।

৫। বিনয় ঘোষ, 'শিল্প, সংস্কৃতি ও সমাজ', অরুণা, কলকাতা, ১৯৪০, পৃ. ৪২

৬। ড. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, 'সাহিত্য বিবেক', গ্রন্থমেলা, কলকাতা, পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণ, ১৯৮৪ , পৃ. ২১৮ - ২৪

৭। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মানিক গ্রন্থাবলী' (২য় খণ্ড), গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৮২ , পৃ. ৩৯৪

৮। শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে কঠোর বামপন্থী মতামত অনুসরণ করার দাবী করা হয় ১৯৩১ এ প্রকাশিত 'মার্কসবাদী' পত্রিকায়। পত্রিকাটি একটি সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে গেলে পুণরায় আটটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৮-১৯৫০ পর্যন্ত সময়ে। ভবানী সেন ছিলেন এই দাবীর প্রবক্তা। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বংলার নবজাগরণকে অস্বীকার করার প্রবণতা দেখা দিলে কবি বিষ্ণু দে এর প্রতিবাদে ঐ সময় প্রকাশ করেন 'সাহিত্যপত্র'। যেখানে রবীন্দ্রনাথ 'চিরন্তনতা ও প্রগতিশীলতা'র ঐক্য আবিষ্কার করেছেন।

৯। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ১৬টি সাক্ষাৎকার, বীণাশিল্প সংকলন, বাণীশিল্প, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ২১

১০। অরুণকুমার সরকার, 'তিরিশের কবিতা এবং পরবর্তী', প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৮১, পৃ. ১৪

১১। শরৎকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বুদ্ধদেব বসু: কবি', দৈনিক কবিতা, বুদ্ধদেব বসু সংকলন, ১৯৭৪, পৃ. ৩১

১২। পঞ্চাশের কবিদের প্রধান প্রধান কয়েকটি বৈশিষ্ট্য :

এক) পূর্ব নির্ধারিত কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসের সঙ্গে সম্পর্কহীন।

দুই) স্বাধীনতা মুগ্ধ কবি বিশ্বাসের ভূমি খোঁজেন প্রতিনিয়ত।

তিন) বিশ্বাস এবং স্বাধীনতার দ্বন্দ্বের টানাপোড়েন দেখা যায় এই পর্বের কবিতায়।

- চার) অতাত্ত্বিক কবিতা অর্থাৎ কোনো রূপ তত্ত্ব বা আইডিয়া এসব কবিতার পেছনে নেই,

নেই ছকবাঁধা পথ।

পাঁচ) কবিতা এখন থেকে মানে বা অর্থ বাতলে দেবে না সে শুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকবে।

- ছয়) কবির সঙ্গে জায়মান কবিতার বিবর্তমান সম্পর্কই এ পর্বের কবিতার সাধ্য শর্ত।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, আধুনিকতার সংজ্ঞা ঃ (আধুনিক কবিতার ইতিহাস ;

সম্পাদনা, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়), ভারত বুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৩ , পৃ. ১৩ - ১৪)

১৩। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, পঞ্চাশ (আধুনিক কবিতার ইতিহাস, সম্পাদনা ঃ অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতবুক এজেন্সী, কলকাতা, ১৯৮৩ , পৃ. ১৪৯-১৫০।

১৪। শঙ্খ ঘোষ, 'শব্দ ও সত্য', 'প্যাপিরাস' কলকাতা, ১৯৮২ , পৃ. ১০৮

১৫। শঙ্খ ঘোষ , দুই বসন্তে, দেশ (সাপ্তাহিক, ২৪ শে মার্চ-২৯ বর্ষ / ২১ সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৬৮৯

১৬। শঙ্খ ঘোষ, দুই বসন্তে, দেশ (সাপ্তাহিক, ২৪ শে মার্চ-২৯ বর্ষ / ২১ সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৬২ , পৃ. ৬৯১

১৭। তদেব, পৃ. ৬৯১

১৮। শঙ্খ ঘোষ , দুই বসন্তে, দেশ (সাপ্তাহিক, ২৪ শে মার্চ-২৯ বর্ষ / ২১ সংখ্যা), কলকাতা, ১৯৬২ , পৃ. ৬৮৯-৯০

১৯। শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়, 'এই দশকের কবিতা', পলাশী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১

২০। 'কবিতা দৈনিক' আর 'দৈনিক কবিতা' — শান্তি লাহিড়ী এবং বিমল রায় চৌধুরীর যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'কবিতা দৈনিক' শুরু হয়। আর 'দৈনিক কবিতা' বেরোয় চুঁচড়ো থেকে। 'কবিতা দৈনিক', 'দৈনিক কবিতা', 'কবিতা ঘন্টিকী' এই সবগুলিরই দাবি – এরা পৃথিবীর ইতিহাসে যে প্রথম এ সম্পর্কে আপত্তি করার কোনো কারণ নেই। তখন কলকাতায় বহু সংখ্যক কবি। আর কবিতারও ছড়াছড়ি। প্রতিজনের পকেট থেকে বেরোয় নতুন কবিতার পান্ডুলিপি।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়(সম্পাদক), 'কৃত্তিবাস সংকলন – ২, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৩৯৩, পৃ. ১৮২ - ৮৩। নিতাই জানা, 'পোষ্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০১ , ২৭

২১। উত্তম দাশ, 'হাংরি শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', মহাদিগন্ত, দঃ ২৪ পরগণা, ১৯৮৬, পৃ. ১০ ২২)মলয়রায় চৌধুরীর হাংরি আন্দোলনের ইস্তাহার জারি :

ক. নির্মমভাবে নিজের সমগ্র বিকাশ।

খ. নিজেকে এবং সমস্ত জিনিসকে সমস্ত দিকে থেকে অনাবৃত করতে হবে।

গ. কোনো একটি মুহূর্তে নিজের খণ্ডিত রূপের ক্ষণিক দৃষ্টিগোচর করতে হবে।

ঘ. কোনো কিছুকে গ্রহণ বা বর্জন করার জন্য প্রত্যেকটি মূল্যকে চ্যালেঞ্জ করতে হবে।

ঙ. প্রথমেই প্রত্যেকটি জিনিসকে গ্রহণ করতে হবে, উভযোজ্যতার দিকে থেকে সেটা কিছুই নয়

অথবা অনেক কিছু, জীবন্ত অথবা মৃত।

চ. সব দিকে থেকে এটিকে বাস্তব হিসেবে গ্রহণ না করে পরীক্ষা করতে হবে।

ছ. গদ্য এবং পদ্যের গৃহীত রীতি যা মুহূর্তের মধ্যে কবি এবং তার পাঠকের মধ্যে যোগাযোগ তৈরী

করতে পারে তা রদ করে যোগাযোগের রীতি খুঁজতে হবে।

জ. কবিতায় একই ভাষা ব্যবহার করতে হবে যা সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়।

ঝ. শব্দের উচ্চারণ বোঝার জন্য শব্দকে ব্যবহার করতে হবে যা সাধারণ কথাবার্তায় ব্যবহৃত হয়।

ঞ. শব্দের সংমিশ্রণের প্রচলিত ধারণাকে বর্জন করে অপ্রচলিত এবং অগৃহীত শব্দের সংমিশ্রণকে

গ্রহণ করতে হবে।

ট. কবিতায় চিরাচরিত বা প্রথাগত রীতিকে বর্জন করে কবিতাকে তার নিজস্ব আকারকে গ্রহণ

করতে হবে।

ঠ. সীমাবদ্ধতা বাদ দিয়েও কবিতাকে মানুষের মৌলিক ধর্ম হিসেবে মেনে নিতে হবে।

ড. অবিরত স্থায়ীত্বের বার্তা এবং বিরাগের অর্থ বা জ্ঞানকে তীক্ষ্ম ক্ষুরধার ভাষায় গতিময়তার সাথে

প্রেরণ করতে হবে।

ঢ. ব্যক্তিগত চরমপত্র।

উত্তম দাশ:'হাংরি- শ্রুতি ও শাস্ত্রবিরোধী আন্দোলন', মহাদিগন্ত, দক্ষিণ ২৪পরগণা, ১৯৮৬, পৃ.১১–১২

২৩. ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত ঘোষণা পত্রটির মুল বক্তব্য:

ক) কোনরকম ব্যাখা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।

খ) চিৎকার বা বিবৃতি এর কোনটাই কবিতা নয়। রাজনীতি প্রচারিত সামাজিকতা বা ক্ষুৎকার যৌনকাতর জৈবমত্ততার স্থান আর যেখানেই থাকুক কবিতায় নেই।

গ) ব্যক্তির কল্পনাময় আন্তরিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রকাশে ব্যক্তিত্বের পরিমণ্ডল রচনাই কবিতা। তাই কবিতা হবে ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।

ঘ) এছাড়া কবিতায় কোন একমুখী বক্তব্য বা একটি মাত্র বিষয় থাকে না থাকে অনুভব মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ।

ঙ) ব্যক্তিগত বিষয়ের জন্য দরকার ব্যক্তিগত রচনারীতি। আর রচনাপদ্ধতি এবং রচনার অবিচ্ছেদ্য। তাই বিবৃতিধর্মী জীর্ণ প্রকাশ পদ্ধতি ত্যাগ করে সব সময়ই উপযুক্ত প্রকাশ রীতি খুঁজতে হবে, যার মাধ্যমে রচনা করা যায় ব্যক্তিত্বের সেই রহস্যময় পরিমণ্ডল যাতে থাকে দৃশ্য-শব্দ-গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শের ব্যাখ্যাতীত সমন্বয়।

চ) সবশেষে বলা দরকার যে চরিত্রের স্থবিরতার চেয়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতাই আমাদের লক্ষ্য।"

অশোককুমার মিশ্র, 'আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা', স্বাধীনতা থেকে স্বাধীনতা; দে'জ, কলকাতা ২০০২, পৃ. ৩৯৪-৩৯৫

২৪। নিতাই জানা, 'পোষ্টমডার্ন ও উত্তর আধুনিক বাংলা কবিতা পরিচয়', বাণীশিল্প, কলকাতা, ২০০১ , পৃ. ২৭

২৫। মিহির চক্রবর্তী, : 'বাংলা কবিতার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও সত্তরের কবিতা', নান্দীমুখ, বর্ষ-১৮, সংখ্যা-২, ১৯৭৮ , পৃ.৪

২৬। উত্তম দাশ, 'কবিতা : ষাট সত্তর', মহাদিগন্ত, বারুইপুর, ২৪ পরগণা, ১৯৮২, পৃ. ১৬

২৭। বিপ্লব মাজী, 'বীতশোক, যতদূর মনে পড়ে', জ্বলদর্চি, জানুয়ারি - ডিসেম্বর ২০০৫ : ৪৯, ১৩ বর্ষ, ১-৪ সংখ্যা, মেদিনীপুর, ২০০৫, পৃ. ৪৯

২৮। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অভিধান', 'বাণীশিল্প', কলকাতা, ১৯৮৪, পৃ. ৩৬

২৯। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অগ্রন্থিত কবিতা', ১৯৭০ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত। কবি বীতশোক ভট্টাচার্যের কিছু কিছু কবিতা এখনো প্রকাশিত হয় নি। 'বিচার' কবিতাটি এই পর্যায়ের অন্তর্ভূক্ত।

৩০। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা', প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারী–১৯৯১, পৃ. ০৯

৩১। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'নতুন কবিতা', তাম্রলিপ্তি, কলকাতা, ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ. ০৯

৩২। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ. ২১

৩৩। সাক্ষাৎকার (অর্হণ, সম্পাদক : কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়),হাওড়া, ১৯৯৬, পৃ. ২০

৩৪। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'এসেছি জলের কাছে,' অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৩৯৩, পৃ. ০৩

৩৫। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'শিল্প', কালবেলা, তমলুক, ১৯৮৬, পৃ. ২৭

৩৬। তদেব, পৃ. ২৩

৩৭। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'অন্যযুগের সখা', প্রতিভাস, কলকাতা, ১৯৯১, পৃ . ৫৬

৩৮। তদেব, পৃ. ২৪

৩৯। তদেব , পৃ. ১১

৪০। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'নতুন কবিতা', তাম্রলিপ্তি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৩৯

৪১। তদেব, পৃ. ১৭

৪২। তদেব, পৃ.৪৮

৪৩। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'এসেছি জলের কাছে', অমৃতলোক, মেদিনীপুর, ১৩৯৩, পৃ.৭

৪৫। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন,' এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, প্রাঃ লিঃ কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃ. ৪২

৪৪। বীতশোক ভট্টাচার্য, 'নতুন কবিতা', তাম্রলিপ্তি, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৫১

৪৫। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 'তিন হাজার বছরের লোকায়ত জীবন,' এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী, প্রাঃ লিঃ কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৩৮৩, পৃ. ৪২